কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

দ্বীপরহস্য

শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

দ্বীপরহস্য

শামসুদ্দীন নওয়াব

কপারটাউনে বেড়াতে গেল তিন গোয়েন্দা।
জিনার মলিফুফুর কাছে।
ভাঙাচোরা নিউ ফোর্ট দুর্গের টাওয়ার-রুম থেকে সরাসরি পশ্চিমে তাকালে মাঝে মাঝে দেখা যায় এক রহস্যময় দ্বীপ–আইল অভ ডিজাস্টার। কাজের লোক–বদরাগী মেক্সিকান-ইন্ডিয়ান নিকি মন্টিয়ানো বলে ওটা অশুভ এক খনি-দ্বীপ, ওটার দিকে তাকালেও নাকি ভয়ঙ্কর বিপদ হয়।
তাকাল তিন গোয়েন্দা। এমন কী নিকির বোট চুরি করে ঘুরেও এল দুর্গম ওই দ্বীপ থেকে।
খনিতে নেমেই পেয়ে গেল ওরা রহস্যের সন্ধান।
আর বিপদ? হ্যাঁ, তারও কোন অভাব নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-16-1505-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.amcbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Tin Goyenda Series
DWEEPRAHOSHYO
A Thriller Novel
By: Shamsuddin Nawab

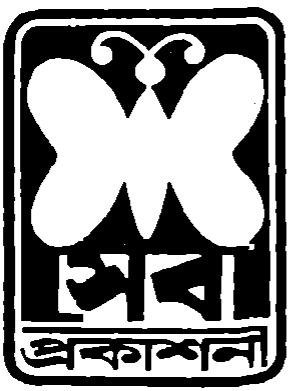

আটাশ টাকা

mmhs013

পরিচয়

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান–ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড–বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।
এসো না, চলে এসো আমাদের সঙ্গে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

চমকে উঠল মুসা।

ব্যাপারটা কী! কথা বলে কে!

ছুটির দিন। নির্জন দুপুর। খোলা ছাদে চিলেকোঠার ছায়ায় বসে একমনে স্কুলের হোমওঅর্ক করছিল ও। একা। হঠাৎ মনে হলো কাছেই কে যেন কথা বলে উঠল।

অথচ কেউ নেই কোথাও।

ভয়ে-ভয়ে চারপাশে তাকাল মুসা।

'কী হলো? কানে যায় না কথা? দরজা বন্ধ করছ না কেন?' আবার কর্কশ, বিরক্ত কণ্ঠে ধমকে উঠল কেউ।

আরে! উপুড় হয়ে লিখছিল, মুহূর্তে সিধে হয়ে বসল ও। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি।

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। দু-পাশ থেকে ওদের বাড়ির ছাদের উপর ঝুঁকে আছে ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া বুড়ো ওকের ডাল। ওর মনে হলো ডানদিক থেকে এলো কথাগুলো। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওদিকে।

'খাইছে! কাউকে তো দেখা যায় না কোথাও!' ভাবল মুসা।

'আর দরজা কোথায় যে বন্ধ করব?'

'দাঁড়াও, আসছি! দেখাচ্ছি মজা!' আবার বলে উঠল অদৃশ্য কণ্ঠস্বর। রীতিমত রেগে গেছে। 'ঘাড় মটকে দেব কিন্তু! কতবার বলেছি তোমাকে পা মুছে ঘরে ঢুকতে?'

ভয়ে জ্ঞান উড়ে গেছে মুসার। একবার ভাবল চিৎকার দিয়ে মাকে ডাকবে কি না। কিন্তু তক্ষুনি বুঝতে পারল, শুনতে পাবে না, মা এখন রান্নাঘরে। ভাবছে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কী করে। রাস্তা পাচ্ছে না। শেষে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'কিন্তু পাপোশ কোথায় যে পা মুছব? আর দরজা...'

'আবার কথা বলে!' প্রচণ্ড এক ধমকে থামিয়ে দিল ওকে কণ্ঠস্বরটা। খুক-খুক করে কাশল দু'বার। 'কোনও কথা শুনতে চাই না। যাও, এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে এসো!'

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল মুসা, এবার আদেশ এল, 'খবরদার, নড়বে না! আরে, হাঁচি মারে যে আবার? কতবার না বারণ করেছি যেখানে-সেখানে নাক ঝাড়বে না! রুমাল কোথায় তোমার?'

কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না মুসা।

ভয়ও হচ্ছে, আবার শুধু-শুধু একটানা বকা খেয়ে রাগও লাগছে। বলল, 'আপনি খামোখা বকছেন আমাকে। আমি হাঁচিও দিইনি, নাকও ঝাড়ছি না। আপনি কোথায়...'

'আবার কথার ওপর কথা! তোমাকে হাজার বার বলেছি, আমার মুখের ওপর কথা বলবে না! যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো!'

কীসের পাল্লায় পড়েছে, বুঝতে আর বাকি নেই মুসার। আলগোছে কেটে পড়তে হবে এখন। 'যাচ্ছি,' বলে খাতা-কলম

ফেলেই গুটি-গুটি পায়ে এগোলো সিঁড়িঘরের দিকে। দু-পা এগিয়েই জমে গেল জায়গায়। হঠাৎ হা-হা-হা করে হেসে উঠল পাগলা ভূতটা। তারপর ডেকে উঠল অবিকল মোরগের ডাক, 'কুক-কুড়ুকু!' পরমুহূর্তে পিলে চমকানো এক অপার্থিব চিৎকার দিয়েই কাতর কণ্ঠে বলল, 'বাবারে! গেছি!'

ঘাড় ফিরিয়ে ডাইনে চাইতেই দেখতে পেল মুসা ওটাকে। অপূর্ব সুন্দর একটা কাকাতুয়া বসে রয়েছে ওকের ডালে। ধবধবে সাদা শরীর, ঝুঁটিটা হলুদ। মাথা কাত করে কুচকুচে কালো উজ্জ্বল চোখ মেলে দেখছে ওকে।

হাঁ করে চেয়ে রইল মুসা ওটার দিকে। বড়বড় নখওয়ালা একটা পা তুলে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথাটা একটু চুলকে নিল ওটা। তারপর একটু নরম গলায় বলল, 'যাও, পাজি ছেলে, ঘুমাতে যাও।' পরমুহূর্তে রাগী কুকুরের মত 'গরর্' আওয়াজ করল।

হেসে ফেলল মুসা।

'এতক্ষণ তুমিই তা হলে কথা বলছিলে! ওদিকে ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেছে। কোত্থেকে পালিয়ে এসেছ বলো তো?'

'হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো!' দুটো হাঁচি দিয়ে নিজেকেই ধমক মারল ওটা, 'রুমাল কোথায় তোমার?'

হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। পরমুহূর্তে ওকে নকল করে ঠিক একই ভঙ্গিতে হেসে উঠল কাকাতুয়াটাও। পকেট থেকে একটা টফি বের করে দেখাল এবার মুসা। উড়ে এসে ওর কাঁধে বসল কাকাতুয়া।

'খাও, লক্ষ্মী ছেলে; খাও তো, সোনা।'

খোসা ছাড়িয়ে দিতেই তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওটা। কেন যেন মুসার মনে হলো খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা। আরেকটা টফি বের করল ও। খুশি হয়ে কাকাতুয়া বলল, 'ঠাণ্ডা আসছে! দরজাটা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার!'

এসব বছর তিনেক আগের কথা।

কাকাতুয়াটা রয়ে গেছে মুসার কাছেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওর নাম কিকো। ওকে পুষত পাশের শহরের এক ছেলে। বদরাগী এক চাচার কাছে থাকত ছেলেটা। কী এক অসুখে মনিব মারা যাওয়ায় মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে ও। ওরা কেউ আর পাখিটাকে ফেরত নিতে চাইল না। সেই থেকে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে ও মুসার কাঁধে। বাড়িতে সারাক্ষণ থাকে ওর সঙ্গে-সঙ্গে; রাতে ডানার নীচে মাথা গুঁজে ঘুমায় ওর খাটের স্ট্যাণ্ডে বসে; কখনও কড়া শাসন করে, কখনও আদর দিয়ে সঠিক পথে পরিচালনা করে চলেছে মুসাকে।

এবারের ছুটিতে জিনার আমন্ত্রণে গোবেল বীচে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু কাকাতুয়াটার জ্বালায় টিকতে পারেনি। বন্ধুদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে এবার কিকোকে সঙ্গে এনেছে মুসা। কিন্তু জিনার আব্বা বিজ্ঞানী পার্কার ওর হুমকি-ধমকি মেনে নিতে পারলেন না। সবার অলক্ষে ও আলগোছে ল্যাবে ঢুকে পিছন থেকে 'খুক' করে কেশে উঠে চমকে দিয়েছে তাঁকে, হা-হা করে হেসে টিটকারি মেরেছে, তারপর উপদেশ দিয়েছে: দরজাটা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার! যাও, এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে এসো!

এতটা সহ্য হয়নি বিজ্ঞানীর। পরদিন খাবার টেবিলে লোভ দেখিয়েছেন: ছুটি যদি সত্যিই উপভোগ করতে হয়, তা হলে তিন গোয়েন্দার যাওয়া উচিত তাঁর বোনের ওখানে। কপ্যারটাউনে। সেখানে পাহাড়, সমুদ্র আর হাজার হাজার পাখি আছে। পরিত্যক্ত খনি আছে অসংখ্য। পিকনিক স্পট আছে অগুনতি। টানেলগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগানো। কয়েকশো বছরের পুরানো একটা ভাঙা দুর্গে থাকেন জিনার ফুফু আর ফুফা। ওরা যদি চায়, তা হলে তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

দু'দিন পর জিনার সঙ্গে ট্রেনে চেপে এখন সেই কপার-টাউনেই চলেছে তিন গোয়েন্দা। রেল লাইনের দুধারে কখনও দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কখনও জঙ্গল, কখনও বা উঁচু-নিচু পাহাড়। টানেলের ভিতর ট্রেনের প্রচণ্ড আওয়াজে প্রথম একবার-দুবার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল কিকো, তারপর খোলা প্রান্তরে এসে দিব্যি সে-আওয়াজ নকল করে কামরার সবাইকে হাসাচ্ছে।

বাতাসে ভেজা আর লোনা ভাব টের পাওয়া গেল কপার-টাউনে পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগে থেকেই। জিনা আগেও একবার-দু'বার এসেছে এখানে। বলল, 'শহর থেকে প্রায় মাইল দশেক পাহাড়ি পথ পেরুলে পৌঁছব আমরা নিউ ফোর্টে।'

'ট্রেন থেকে নেমে কি বাস ধরব আমরা?' জানতে চাইল রবিন।

'আরে, না। ওখানে বাস-টাস কিচ্ছু যায় না। ইলেকট্রিসিটিও নেই, খাওয়ার পানি নিজেদেরই তুলে নিতে হয় ইঁদারা থেকে।'

'বাস নেই, তা হলে আমরা পৌঁছব কি হেঁটে?' বলল মুসা।

'ঝক্কড়ে একটা গাড়ি আছে ফুগার। বদমেজাজি এক হাফব্রীড কাজের লোক আছে, নিকি মন্টিয়ানো। সে চালায় গাড়িটা। জঘন্য ড্রাইভার। সেই নিকি আসবে আমাদের নিতে।'

সত্যি, দেখা গেল লম্বা-চওড়া, পেশিবহুল এক আধা-ইন্ডিয়ান দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে, ট্রেন থামতেই এগিয়ে এল। হাসি নেই মুখে, যেন মহা বিরক্ত হয়েছে হঠাৎ ওরা এসে পড়ায়। তিন গোয়েন্দাকে সামান্যতম পাত্তা না দিয়ে জিনার দিকে দয়া করে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল, তারপর সুটকেসগুলো নামাল বগি থেকে। ওর হাব-ভাব পছন্দ না হওয়াতে ওকে তক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বলল কিকো।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল নিকি। যেন কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, এমনি ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকে মেক্সিকান ইংরেজিতে বলল, 'তু-তুমি নিজের চরকায় তে-তেল দাও গে, বুঝলে?'

ঝুঁটিটা একবার খাড়া করে নামিয়ে নিল কিকো, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'চোপরাও! একদম চুপ! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি!' এর পর চাপা গর্জন ছাড়ল 'গর্‌র্‌...'

চমকে গেল নিকি। জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা পা-প্লাখি, না কুকুর?'

হাসল জিনা, জবাব দিল না। নিকির বেয়াড়া ভাবটা ওর পছন্দ হয়নি। সবাই গাড়িতে চড়ে বসতেই উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে উন্মাদের মত গাড়ি ছোটাল নিকি। কিছুদূর যেতেই সাগর দেখতে পেল ওরা, ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাথুরে পাড়ে প্রবল বিক্রমে।

পথে বেশ কিছু বাড়িঘর পড়ল। কিন্তু সবই ভাঙাচোরা, বা আগুনে পোড়া। যুদ্ধের সময় যা ক্ষতি হয়েছে সেসব কেউ আর মেরামত করবার চেষ্টা করেনি।

বিপজ্জনক গতিতে ছুটছে বুড়ো গাড়ি, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে বাচ্চা ছাগলের মত। তবে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই পৌঁছে গেল ওরা নিউ ফোর্টে। একটা টিলার গায়ে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল, সমুদ্র থেকে বেশ অনেকটা ওপরে। গাড়ি থেকে নেমে হাঁফ ছাড়ল সবাই। করুণ সুরে কিকো বলল, 'বাবারে! গেছি!'

খোলামেলা প্রকৃতি—পাহাড়-সমুদ্র-আকাশ দেখে যাত্রার ক্লান্তি ভুলে গেল তিন গোয়েন্দা। হাসি-খুশি এক মহিলা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। জিনা পরিচয় করিয়ে দিল ফুফুর সঙ্গে সবার।

'জিনা নীচতলার একটা ঘরে থাকতে পারবে,' বললেন ফুফু। 'কিন্তু এত কম সময়ে তোমাদের জন্যে টাওয়ার-রুম ছাড়া আর কোথাও জায়গা করা গেল না, কিশোর।'

'কিন্তু ওখানে তো খাট নেই,' আপত্তি জানাল জিনা। 'তা ছাড়া গতবার দেখেছিলাম একটা জানালার কাঁচ ভাঙা। হু-হু করে ভেজা বাতাস ঢোকে ঘরে।'

'কোনও অসুবিধে হবে না আমাদের,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'মেঝের ওপর তোশক বা জাজিম পেতে নিলেই চলবে। আর জানালায় কাঁচ না থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং জোর বাতাসে মনে হবে সাগরের ধারে ক্যাম্প করেছি।'

অসুবিধেটা কিশোর সহজ ভাবে মেনে নেওয়ায় খুশি হলেন মলিফুফু। বললেন, 'তবে এত হাওয়ায় রাতে মোমবাতি জ্বালাতে

পারবে না। তোমাদের জন্যে একটা হ্যারিকেনের ব্যবস্থা করতে হবে। এবার সবাই হাত-মুখ...'

ফুফুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হুকুম জারি করল কিকো, 'যাও, এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে এসো। নইলে ঘাড় মটকে দেব!'

'বাবারে!' তাজ্জব হয়ে গেলেন ফুফু। 'বলে কী!'

সবাই হেসে উঠল। কেবল নিকি মন্টিয়ানো ভুরু কুঁচকে রাখল বিরক্ত ভঙ্গিতে। তাকে ছেলেদের মালপত্র আর তিনটে তোশক টাওয়ার-রুমে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন ফুফু।

আত্মভোলা ইতিহাসবিদ প্রফেসর অ্যালবার্ট স্যামুয়েলসন সম্পর্কে সব কথা আগেই ওদের জানিয়েছে জিনা, তাই খাবার টেবিলে তাঁর অনুপস্থিতিতে অবাক হলো না তিন গোয়েন্দা। খাওয়া-দাওয়ার পর জিনাকে নিয়ে দরজায় দুটো টোকা দিয়ে প্রফেসরের লাইব্রেরিতে ঢুকলেন মল্লিফুফু। প্রাচীন পুঁথি থেকে অনেক কষ্টে তাঁর মনোযোগ টলানো গেল।

'শুনছ? কই, শুনছ? জিনা বেড়াতে এসেছে। সঙ্গে ওর তিন বন্ধু আর একটা কাকাতুয়াও এসেছে।'

'কাকাতুয়া?' বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন ফুফা, 'ওটা কীসের জন্যে?'

'ওই ছেলেদের একজনের সঙ্গে এসেছে ওটা। বললাম না, জিনার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে ওর তিন বন্ধু।'

'বিদায় করো ওদের। কাকাতুয়াটা তুমি রাখতে পারো ইচ্ছে করলে। আর এখন যাও, খুব ব্যস্ত আছি আমি। ওদের বলে দাও,

অন্য কোথাও গিয়ে গোলমাল করুকগে যাক, এখানে না।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন ফুফু। জিনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পাথুরে একটা খাড়া, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তিন গোয়েন্দা টাওয়ার-রুমে। বড়সড় ঘরটা গোল। সাফ করা হয়েছে সম্প্রতি। তিন দিকে তিনটে জানালা। সমুদ্রের দিকের জানালায় কাঁচ নেই। ধুচুর হাওয়া ঘরে। নীচ থেকে ভেসে আসছে ঢেউয়ের গর্জন আর পাখির ডাক। ভাল লাগল ওদের ঘরটা। খানিক পর জিনা এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

মালপত্র আগেই পৌঁছে গেছে, তিনটে তোশকও হাজির. এবার বিশাল এক জাজিম নিয়ে উঠে এল নিকি। ধপাস করে ওটা মেঝেতে ফেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

'কী দেখো, নিকি?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'এই ঘরেও ভূত-টুত আছে নাকি?' চোখ টিপল তিন গোয়েন্দার উদ্দেশে।

'এসব ম-মশকরা করার বিষয় না,' বলল নিকি। গম্ভীর। এই বাড়ির নানান জায়গায় নিজের চোখে ভূত দেখেছে ও। তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে রেগে যায়। চোখ পাকিয়ে বলল, 'বি-বিশেষ করে এই ঘরটাতেই আছে!'

'বলো কী!' ভুরু জোড়া কপালে উঠল মুসার। ভয় পেয়েছে।

'আমি স-সকালেই বারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা কানে ত-তুলল না ম্যাডাম। কু-কুয়াশা না থাকলে এই ঘর থেকে পশ্চিমে আবছা দেখা যায় আইল অভ ডি-ডিজাস্টার। একমাত্র এই ঘরটা থেকেই।'

'দেখা গেলে কী হয়?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওটা একটা অশুভ দ্বীপ! ভয়-ভয়ঙ্কর সব অপরাধ আর খুনখারাবি হয়েছে ওখানে একসময়। ওটার দিকে তা-ত্তাকালেও বিপদ হয়।'

'যাহ্! বাজে কথা!' বলল জিনা।

'যাহ্! বাজে কথা!' একই সুরে বলল কিকোও।

কড়া চোখে দুজনের দিকে চাইল নিকি, তারপর ঝট্ করে ঘুরে ধুপ-ধাপ পা ফেলে নেমে গেল নীচে।

'মাথায় ছিট আছে নি-ন্নিকি ব্যাটার,' বলল জিনা। 'অন্য যে-কোনও জায়গায় ভাল বেতনে কাজ পেতে পারে। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে কেন যে এখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছে কে জানে।'

'নি-ন্নিকি ব্যাটা!' বলল কিকো। মুখস্থ করে ফেলেছে।

'আয়-হায়!' বলল রবিন। 'কখন যে বিপদে ফেলবে ওর সামনে নি-ন্নিকি ব্যাটা বলে!'

'নি-ন্নিকি ব্যাটা!' আবার বলল কিকো।

'ওই আইল অভ ডিজাস্টারের ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। জানালার সামনে গিয়ে তাকাল পশ্চিমে। 'কই কিছুই তো দেখা যায় না।'

'ওটা একটা খনি-দ্বীপ ছিল এক সময়ে। দু-আড়াইশো বছর আগেই সব তামা তোলা শেষ। তারপর বেশ কিছুদিন ছিল পলাতক চোর-ডাকাত আর জলদস্যুদের আস্তানা। দ্বীপটা ঘিরে পানির নীচে-ওপরে মারাত্মক সব চোখা পাথর আছে, ফলে সাগর ওখানে সবসময় উত্তাল। কয়শো জাহাজ যে ধাক্কা খেয়ে ডুবেছে,

লেখা-জোখা নেই।'

'কুয়াশা কেন?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর। 'এত বাতাসে তো কুয়াশা থাকার কথা নয়!'

'কুয়াশা না ওটা। শৈলশিরায় বাড়ি খেয়ে ছিটে ওঠা জলকণা। কুয়াশার মত ঢেকে রাখে দ্বীপটাকে। কাছে গেলে তবেই আবছা মতন দেখা যায়। ওই জলকণাই যুগের পর যুগ ধরে আইল অভ ডিজাস্টারকে এত রহস্যময় করে রেখেছে।'

'ওখানে যেতে পারলে হতো,' বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল রবিন। 'নিশ্চয়ই কোনও ট্র্যাম্পপোর্ট নেই?'

'নেই,' বলল জিনা। 'তা ছাড়া একগাদা পাখি ছাড়া ওখানে দেখারও আর কিছু নেই।'

'পাখি দেখতে পাওয়াই বা কম হল কীসে?' বলল রবিন। ইদানীং হরেক জাতের পাখির ওপর বেশ কয়েকটা বই পড়ে আধ-পণ্ডিত হয়ে উঠেছে সে। 'গোটা কয়েক মোক্ষম ছবি তুলে রকি বীচে নিয়ে গিয়ে দেখালে টেরিয়ে যাবে ওটকি টেরির চোখ।'

কথা বলতে বলতে জাজিমের ওপর তোশক বিছিয়ে তার ওপর চাদর পেতে ফেলল তিন গোয়েন্দা।

'চলো, এবার দুর্গের আশপাশটা ঘুরে ফিরে দেখে আসি,' প্রস্তাব দিল মুসা।

সবাই রাজি। সবাই খুশি। আগামী দুটি সপ্তাহ ওরা যখন খুশি পাহাড়ে চড়বে, যখন খুশি সাঁতার কাটবে সাগরে; সুযোগ পেলে নৌকা বাইবে। প্রকৃতি থেকে প্রাণপ্রাচুর্য আহরণ করে নিয়ে ফিরে যাবে রকি বীচে।

আর যদি কপাল গুণে এখানে কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই।

দুই

ইঁদারাটা এতই গভীর যে অবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। স্টীলের লম্বা দড়ির মাথায় হুক দিয়ে আটকানো বড় বালতিটা কোথায় নেমে গেছে দেখা যাচ্ছে না। একটা চাকার হাতল ঘুরিয়ে তুলতে হয় পানি।

'পানিটা মিষ্টি তো, না কি লোনা?' জানতে চাইল মুসা।

'মিষ্টি এবং বরফের মত ঠাণ্ডা,' বলল পিজিনা। 'এই পানি আসছে সমুদ্র-তলদেশেরও নীচের কোনও ঝর্না থেকে।'

দড়ি ঝাঁকিয়ে বালতিটা ভরে খুব সহজেই পিনিয়ন বসানো চাকার হাতল ঘুরিয়ে উপরে তুলে আনল জিনা এক বালতি পানি। সবাই খেয়ে দেখল, একদম ফ্রেশ—সম্ভবত ঝর্নার কারণেই। বদ্ধ পানি হলে মুখ-খোলা ইঁদারায় শতশত বছর ধরে এত পরিষ্কার থাকতে পারত না।

নিউ ফোর্টের ধারে-কাছে জনবসতি নেই, ফলে একটা দোকানও নেই। সপ্তাহে দুইদিন গাড়ি নিয়ে বাজার করতে যায়

নিকি দশ মাইল দূরের শহরে—জানাল জিনা।

'আগামী বার চলো, আমরাও যাব ওর সঙ্গে। শহর থেকে...'

জিনাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল রবিন।

'কাউকে নেবে না ও। কতবার বলেছি, রাজি করাতে পারিনি কোনদিন। গাড়িতেও না, ওর বোটেও না।'

'বোট আছে নাকি ওর?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'আছে, ওই ওদিকে একটা খাঁড়িতে নোঙর করা। কিন্তু ওকে সাধাসাধি করে কোনও লাভ নেই, কিছুতেই রাজি করানো যাবে না।'

'ও কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওই তো, বাড়ির ওপাশে খেত করেছে তরি-তরকারির, ওখানে কাজ করছে। যাবে ওদিকে?'

সবাই মিলে নিকির খেত দেখতে গেল। কাজ থামিয়ে ভুরু কুঁচকে চাইল লোকটা। মনে হলো, ওর ধারেকাছে যাওয়াতেও ওর প্রবল আপত্তি আছে। কাছে গিয়ে রবিন জানতে চাইল কবে নাগাদ শহরে যাবে বাজার করতে।

'তোমাদের সঙ্গে নে-নেয়া যাবে না।'

'আমি একা যাই যদি?' হাল ছাড়ল না রবিন।

'আমি ব-বলেছি না, ঘ্যাস।' শক্তিশালী দুই বাহু বুকে বেঁধে পিছন ফিরল নিকি।

'কেন যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'কী কিনবে?'

'দুটো ফিল্ম কিনতে চেয়েছিলাম আমার ক্যামেরার জন্যে।'

'লিখে দিলে আগামীবার শহরে গেলে ও-ই কিনে এনে দেবে।

এবার চলো, সাগর-তীর থেকে ঘুরে আসি।'

সুন্দর একটা বোট। বালির ওপর টেনে তোলা রয়েছে সিকি ভাগ। নোঙর তো আছেই, একটা খুঁটির সঙ্গেও বাঁধা হয়েছে শক্ত রশি দিয়ে।

'ইশ্! এটায় যদি চড়তে দিত!' আক্ষেপ করল রবিন।

'অসম্ভব,' বলল জিনা। 'আমাদের ওই বোটের কাছে যাওয়াও নিষেধ।'

'ওর অনুমতির তোয়াক্কা না করলে?' বলল মুসা, 'ধরো...'

'খবরদার! গায়ে হাত তুলতেও বাধবে না ওর। এই বোট ওর জানের জান, চোখের মণি।'

ভাল করে দেখবার জন্য কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। নতুন পেইন্ট করা হয়েছে বোটটা। ছিমছাম, ঝকঝকে-তকতকে। দুই জোড়া দাঁড় দেখা যাচ্ছে, পালটা মাস্তুলে জড়িয়ে গুইয়ে রাখা আছে পাটাতনে। একপাশে রয়েছে মাছ ধরার সরঞ্জাম, হুইল-ছিপ, ল্যাডিং নেট ইত্যাদি।

সত্যি, এবারের বেড়ানোটা দশগুণ বেশি উপভোগ করা যেত যদি কেবল এই বোটে করে ওদের মাছ ধরতে নিত নিকি। কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি। যেন জাদুমন্ত্র বলে পিছনে হাজির হল নিকি মন্টিয়ানো, দুই ভুরু কুঁচকে এক করে রেখেছে।

'অ্যাই! কী-কী হচ্ছে ওখানে?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'ওটা আমার বোট।'

'বুঝলাম, তোমার বোট,' বলল কিশোর। 'কিন্তু ওটার দিকে তাকানোও কি নিষেধ নাকি?'

'হ্যাঁ। তা-তাকানোও নিষেধ। আর যদি ওটার গায়ে হাত দাও, ম-মট করে ভেঙে দেব হাতটা।'

'তোমার ঘাড়টা মটকে দেব আমি, নি-নিকি ব্যাটা!' বলে উঠল কিকো।

'থাক, এখন না, পরে দিয়ো,' পাখিটাকে বলল মুসা মুচকি হেসে। বোটের পাশ থেকে সরে গেল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ে উঠছে এখন।

বুকে হাত বেঁধে কটমট করে চেয়ে থাকল ওদের দিকে চরম বিরক্ত নিকি মন্টিয়ানো।

পরবর্তী কয়েকটা দিন ছেলেমেয়েদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল আধা-ইন্ডিয়ান লোকটা। কোথাও হয়তো নিস্তরঙ্গ একটা খাঁড়ি আবিষ্কার করে সাঁতার কাটতে নেমেছে, কিংবা পাহাড়ের গায়ে কোন গুহা আবিষ্কার করে ভেতরে ঢুকবে ভাবছে, কিংবা পাথরের ওপর থেকে ছিপ ফেলেছে পানিতে–পিছন ফিরলে দেখা যাবে খানিক দূরেই মুখ আঁধার করে দাঁড়িয়ে আছে নিকি। সারাক্ষণ ওদের পিছনে লেগে আছে লোকটা, নজর রাখছে প্রতিটা মুহূর্ত।

'তোমার কি আর কাজকর্ম নেই? সারাক্ষণ লেগে রয়েছ আমাদের পেছনে!' বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছে জিনা।

'এটাও আমার কা-কাজ,' অম্লান বদনে বলেছে নিকি। 'তোমাদের দে-দেখে রাখতে বলেছে আমাকে ম্যা-ম্যাডাম।'

'আমাদের ছুটির সমস্ত আনন্দ মাটি করে দিচ্ছ তুমি, সেটা বুঝতে পারছ না?'

'না।'

এর সঙ্গে কথা বলা বৃথা।

'চলো,' বলল কিশোর, 'গুতকালকের সেই গুহার ভেতর ঢুকে দেখি কদ্দূর গেছে ওটা।'

সাগরতীরের গুহামুখগুলো পরীক্ষা করে দেখছে ওরা একের পর এক। কোনওটা অল্প কিছুদূর গিয়েই শেষ, কোনওটা চলে গেছে বহুদূর, ছাদের গর্ত দিয়ে ওপরে উঠলে আবার আরেক গুহাপথ। এসব গুহা একসময় চোরাই মাল লুকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিছুদূর গেলেই আঁধার। ঢুকল ওরা।

'শহর থেকে একটা টর্চ কিনে আনাতে হবে,' বলল কিশোর।

'দাঁড়াও, মোমবাতি জ্বালছি।' পকেট থেকে আস্ত একটা মোমবাতি আর ম্যাচ বের করল রবিন।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, আলো জ্বলে উঠতেই জবান ফুটল কিক্কোর, বলল, 'দাঁড়াও, আসছি!'

সামুদ্রিক গুল্ম বিছিয়ে আছে মেঝেতে। মচ-মচ আওয়াজ তুলে চওড়া গুহায় পাশাপাশি হাঁটছে চারজন। মোমবাতি হাতে সবার ডাইনে রবিন। চলতে চলতে হঠাৎ পা পিছলাল রবিনের। 'আরে!' বলে তাল সামলাতে গিয়ে দপ্ করে নিভে গেল মোমবাতি, অদ্ভুত একটা সড়সড় শব্দ হলো, তারপর সব চুপ।

'কী হলো, রবিন? মোমবাতিটা জ্বালো। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!' বলল কিশোর।

কোনও সাড়া নেই।

হাত বাড়িয়ে যেখানে ছিল সেখানে রবিনকে পেল না

কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, রবিন! কোথায় তুমি?'

আবছা ভেসে এলো রবিনের কণ্ঠস্বর, 'তোমরা কোথায়?'

'ওই তো রবিনের গলা। হঠাৎ এত দূরে চলে গেল কী করে? রবিন, আলোটা জ্বালো! কোথায় গেলে তুমি?'

'নীচে পড়ে গেছি,' বলল রবিন। একটু পরেই ম্লান একটা আলো দেখা গেল পায়ের কাছে লতা-গুল্মের ফাঁক দিয়ে।

সাবধানে এগিয়ে হাত লম্বা করে ওগুলো একপাশে সরাতেই দেখা গেল গুহামুখ। মেঝেটা তেরছা ভাবে নেমে গেছে নীচে। ওখানে আরেকটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে, পুব দিকে। ভাল করে দেখতে গিয়ে সড়াত করে নেমে গেল মুসাও। 'চ্যাঁ' করে আপত্তি জানাল কিকো, পাখা ঝাপটে কোনমতে ভারসাম্য বজায় রাখল মুসার কাঁধে। মুসার নীচে পৌঁছবার অপেক্ষায় চুপ করে ছিল কিশোর, এবার জিজ্ঞেস করল, 'দেখো তো, ওটা পাহাড়ের গায়ে গর্ত, না কোনও গুহা।'

রবিন মোমবাতি হাতে কিছুদূর গিয়ে ফিরে এল। 'মনে হচ্ছে গুহাই। তবে বাজে সোঁদা গন্ধ। এখন ওপরে ওঠা যায় কী করে?'

'ওঠার দরকার নেই, নামছি আমিও,' বলে জিনার দিকে ফিরল কিশোর। 'একটা মোমবাতি দিয়ে যাচ্ছি, তুমি এখানেই থাকো। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে লোক ডেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা কোরো।'

'আমিও নামি,' বলল জিনা।

'যদি আটকা পড়ি চারজনেই? প্রয়োজন হলে সাহায্যের জন্যে একজনের নিরাপদে থাকা উচিত না?'

কথাটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল জিনা। রবিনের কাছ থেকে একটা মোমবাতি চেয়ে নিয়ে জ্বালল কিশোর। ওটা একটা শুকনো পাথরে বাসিয়ে দিয়ে সড়-সড় করে নেমে গেল নিচে।

'মনে হচ্ছে নিউ ফোর্টের নীচ দিয়ে চলে গেছে সুড়ঙ্গটা,' বলল রবিন।

'কিন্তু আবার ওই কুয়োয় গিয়ে পড়ব না তো?' চলতে চলতে আশঙ্কা প্রকাশ করল মুসা।

'এগোলেই বোঝা যাবে সেটা,' আশ্বস্ত করল কিশোর। 'পথটা নীচের দিকে ঢালু হতে দেখলেই ফিরে আসব আমরা।'

অল্পক্ষণেই ছেলেদের গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। মোমের নিষ্কম্প আলোয় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে একা বসে থাকল জিনা, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

ওদিকে এঁকেবেঁকে কিছুদূর গিয়েই উচ্চতা কমে গেল সুড়ঙ্গের —মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোমের আলোয় পথ সামান্যই দেখা যাচ্ছে। এখনও অল্প হলেও উপর দিকেই উঠছে গুহা।

পচা গুল্মের সোঁদা গন্ধটা কমে গেছে বটে, কিন্তু ওদের মনে হল বাতাসে এখানে অক্সিজেন কম। বাসি একটা দম আটকানো ভাব। সামনে ভাল বাতাস পাওয়ার আশায় এগিয়ে চলল ওরা।

'বাতাসটা তো বেশ খারাপ মনে হচ্ছে!' হাঁফ ধরা গলায় বলল রবিন। 'মোমটাও নিভু-নিভু ভাব করছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় এসে পড়লাম নাকি!'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বেশ খাড়া ভাবে উপরে

উঠতে শুরু করল গুহা। ধাপের মত ঠেকল ওদের পায়ে। দশ কি বারো ধাপ উঠেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল গুহাপথ।

'গুহা না তা হলে,' বলল কিশোর। 'পাহাড়ের একটা ফাটল। কিন্তু এই ধাপগুলো তো মনে হচ্ছে মানুষের তৈরি। এখানে ধাপ তৈরির কী কারণ থাকতে পারে?'

মোমবাতি নিচু করে ধরল রবিন। দেখা গেল সত্যিই ধাপগুলো মানুষেরই তৈরি।

'আশ্চর্য!' বলল কিশোর। 'ওপরে তোলো দেখি মোমটা?'

আলোটা মাথার ওপর তুলে ধরেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন; 'দেখো, কিশোর: একটা ট্র্যাপডোর দেখা যাচ্ছে! এসো, ধাক্কা দিয়ে দেখি খোলা যায় কি না।'

সত্যিই। মাথার উপর পুরু কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে। এই তক্তা সরাতে পারলে কোথায় পৌঁছবে ওরা?

তিন

তিনজনে পাঁচ হাতে ঠেলা দিল তক্তাটা উপর দিকে। একরাশ ধুলো-ময়লা পড়ল ওদের চোখে-মুখে, নড়ল না তক্তা।

'দাঁড়াও একটু,' চোখ ডলতে-ডলতে বলল মুসা। চোখের

পানিতে ময়লা পরিষ্কার হলে রবিনকে বলল, 'ওই পাথরের খাঁজে গুঁজে দাও মোমবাতিটা, তারপর দুই হাত লাগাও। দেখি সবাই মিলে...' এবার মনে হল সামান্য একটু নড়ল তক্তা।

আরেক ধাক্কায় ইঞ্চি ছয়েক উঠল ওটা, তারপর আবার এক গাদা ধুলো ঝরিয়ে নেমে এলো নীচে। এইবার বড়সড় কয়েক খণ্ড পাথর কুড়িয়ে আনল মুসা। ওর ওপর দাঁড়িয়ে 'মারো জোয়ান, হেঁইয়ো!' বলে তিনজন একসঙ্গে ধাক্কা দিতেই দড়াম করে উল্টে পিছনে পড়ল কাঠের ভারী তক্তা। মাথার ওপর চারকোনা একটা কালো গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

'এবার আমাকে একটু তুলে ধরো দেখি,' বলল কিশোর।

'আমার কাঁধে ওঠো,' বলে হাঁটু গেড়ে শক্ত হয়ে বসল মুসা। কিশোর ওর কাঁধে উঠতেই ধীরে-ধীরে দাঁড়াল ও। বলল, 'বাতিটা তুলে ভেতরটা আগে দেখে নাও, কিশোর।'

রবিন এগিয়ে দিল মোমবাতি।

'বাক্স দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো,' বলল কিশোর। 'জলদস্যুর লুকানো গুপ্তধন পেয়ে গেলাম কি না কে জানে! আমি ওপরে গেলাম, তারপর একে-একে টেনে তুলব তোমাদের।'

কিন্তু ওপরের পাথুরে মেঝেতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দপ করে নিভে গেল বাতি।

'কী হল ব্যাপারটা? হাওয়া কীসের?' ম্যাচের জন্য পকেটে হাত দিল কিশোর।

'খুব সম্ভব কিকো,' বলল মুসা। 'তোমাকে কাঁধে উঠতে দেখে সরে গিয়ে আমার কলার ধরে ঝুলছিল, এখন উড়াল দিয়েছে।'

বাতি জ্বেলে একে একে দুই বন্ধুকে টেনে তুলল কিশোর।

'ঘর মতন লাগছে,' বলল রবিন। 'কোথায় এসে উঠলাম?'

চারদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'আমার মনে হয় নিউ ফোর্টেরই কোনও তলকুঠুরি এটা। ওই দেখো, থরে থরে সাজানো রয়েছে খাবারের টিন। কাঠের বাক্সগুলোতেও সম্ভবত খাবার।'

'কিন্তু এত কেন?' বলল মুসা। 'দেখে মনে হচ্ছে, পুরো ছয় মাসের খোরাক জমা করেছে মলি আন্টি।'

'তোমার এক মাসও চলবে না ওতে,' মৃদু হেসে বলল রবিন। 'গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করছে এটা, কিন্তু আমার মনে হয় না জিনার ফুফা বা ফুফু এই গোপন পথের কথা জানে। যাই হোক, এবার আমাদের বেরোবার পথটা খোঁজা উচিত।'

'হ্যাঁ, কেমন একটা দম আটকানো ভাব লাগছে!' সায় দিল মুসা।

খুঁজে পুরু কাঠের একটা দরজা ওরা পেল ঠিকই, কিন্তু তালা মারা। অর্থাৎ আবার গুহাপথ দিয়েই ফিরতে হবে ওদের এখান থেকে বেরোতে হলে।

'এটা রান্নাঘরের লাগোয়া সেলার না,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'এখানে কোন সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে না। ওই সেলারে নামার জন্যে সিঁড়ি আছে। এটা সম্ভবত সেলারের পাশের ঘর।'

'চুপ, কে যেন আসছে এদিকে!' বলল মুসা। 'পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?'

আগে পায়নি, কিন্তু ও বলায় এখন স্পষ্ট শুনতে পেল রবাই। ভারী পা ফেলে দরজার দিকে আসছে কেউ।

'নিকি মন্টিয়ানো,' বলল কিশোর। 'দরজার বাইরে নিকির কাশির শব্দ শুনতে পেয়েছে ও। লুকিয়ে পড়ো! গুহাপথের কথা ওকে জানানো যাবে না। মুসা, চট্ করে ট্র্যাপডোরটা নামিয়ে দিয়ে এসো। আমরা দরজার পাশে লুকিয়ে থাকব, নিকি ঢুকলে আলগোছে বেরিয়ে যাব এখান থেকে। বাতি নিভালাম!'

নিকষ কালো অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। তালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর খুলে গেল দরজা। হ্যাঁ, নিকিই। এগিয়ে গেল পরে পরে সাজানো টিন বোঝাই বাক্সর দিকে। লণ্ঠনের কাঁপা আলোয় ওর ছায়াটা বিশাল দেখাচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

এই সুযোগে পা টিপে বেরিয়ে যেতে পারত তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ঠিক এই সময়েই নিকির অনুকরণে 'অহ্-হো' করে কাঁপা একটা কাশি দিল কিকো। বড়সড় ঘরটার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। মুহূর্তে জায়গায় জমে গেল নিকি—হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে লণ্ঠন। মেঝেতে পড়ে ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে গেল লণ্ঠনের কাচ, দপ করে নিভে গেল আলো।

ভয় পেয়ে এমনই একটা কলজে কাঁপানো আর্তনাদ ছাড়ল নিকি যে চমকে গেল তিন গোয়েন্দা। ঝড়ের বেগে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকটা। যাওয়ার সময় রবিনের হাতে ছোঁয়া লেগে যাওয়ায় শিউরে উঠে ছাড়ল আরেক বিকট আর্তনাদ। কাশির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবার অপার্থিব এক মরণ-চিৎকার দিল্ কিকো। দরজায় ধাক্কা লাগাবে, কিকোর চিৎকার শুনে তিনগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল নিকি নিজেও, 'আউ-আউ' করে কী

বলল বোঝা গেল না: এক দৌড়ে হুড়মুড় করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। দড়াম করে দরজা খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে কিচেনে।

রান্না করছিলেন, চমকে লাফিয়ে উঠলেন মলিফুফু।

'কী হল? কী হয়েছে তোমার, নিকি?'

'ভূ-ভূ-ভূ-উ-উ-ত!' রক্তশূন্য মুখ নিকির, দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। 'নী-নীচের সেলারে!'

'কী বাজে বকছ!' ধমক দিলেন বটে, কিন্তু নিকির ভয় দেখে কাঁপ ধরে গেল তাঁর নিজের বুকের ভিতরেও।

'বা-বাজে না, ম্যাডাম! আমার কানের কাছে কা-কাশি দিয়েছে, তারপর হাত টেনে ধরতে গেছিল! বাবা রে! তারপর যে-রকম চিৎকার দিল পি-পিশাচটা...' ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে নেতিয়ে পড়ল নিকি।

চট করে একটা গ্লাসে খানিক লবণ-পানি গুলিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন মলিফুফু।

ওদিকে হাসতে হাসতে তিন গোয়েন্দার পেট ফেটে যাওয়ার জোগাড়। গাল ব্যথা হয়ে গেছে, বিচিত্র সব আওয়াজ বের হচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে—কিন্তু কিছুতেই থামতে পারছে না। শেষে মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা। তাই দেখে খিট-খিট করে হাসছে কিকোও।

'ব্যাটা জ্বালিয়ে মেরেছে গত কয়েকটা দিন,' বলল কিশোর। 'ভয় দেখিয়ে কাবু করতে চেয়েছিল আমাদের। এবার ভয় কাকে বলে আমরাই দেখিয়ে দিয়েছি ওকে!'

'জিনা শুনলে হেসে খুন হয়ে যাবে,' বলল মুসা।

'আরে, দেখো, চাবি ফেলেই পালিয়েছে ব্যাটা,' বলল রবিন। মোমবাতিটা জ্বেলেছে ও আবার।

এগিয়ে গিয়ে তালা থেকে চাবিটা বের করে পকেটে পুরল কিশোর। বলল, 'যখন খুশি এই পথে আসা-যাওয়া করা যাবে এখন।' দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে এল সে। অনেকগুলো বাক্স পড়ে আছে দরজার দুপাশে। 'দেখেছ? খালি কার্টনগুলো দিয়ে এই দরজাটা আড়াল করা ছিল। জিনার ফুফু হয়তো জানেনই না যে গুদামঘরের ওইপাশে আরও একটা ঘর আছে।' ঠোঁটে চিমটি দিল কিশোর। 'কিন্তু আড়াল কীসের জন্যে?'

ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল রবিন। 'কোন্ দিক দিয়ে ফিরব আমরা এখন জিনার কাছে? সুড়ঙ্গ দিয়ে, না কি রান্নাঘর দিয়ে?'

'চলো, উঁকি দিয়ে দেখি ওপরের রাস্তা ক্লিয়ার কি না,' বলল মুসা। 'তা নইলে আবার ওই অন্ধকার গুহায় ঢুকতেই হবে। কিকো, টুঁ-শব্দ করবি না! একদম চুপ!'

'চু-উ-প!' চাপা কণ্ঠে বলল কিকো মুসার কানে কানে।

রান্নাঘরের দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে প্রথমে চোখ, তারপর কান পাতল মুসা। তারপর আস্তে করে খুলল দরজা। কেউ নেই কিচেনে। পা টিপে সবার অলক্ষে বেরিয়ে গেল ওরা বাড়ি থেকে। এক দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে চলে এলো সাগর-পারে গুহামুখের কাছে।

'না।' বলল কিশোর মুসার মুখে শয়তানি হাসি দেখে। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

'বেশি না, অল্প একটু ভয় দেখাই? ও তো সামনে চেয়ে

থাকবে, পেছনে গিয়ে খালি একটু গুঙিয়ে উঠব।'

'ভেবে দেখো, আমাদের বিপদ হলে সাহায্য করবে বলে কী চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে সুড়ঙ্গ-মুখে অপেক্ষা করছে ও, আমাদের বন্ধু,' গম্ভীর কিশোর। 'জিনাকে নিয়ে, আর যাই হোক, মশকরা করা যায় না। ও আমাদের সত্যিকারের বন্ধু।'

কথাটা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিল মুসা ও রবিন। ভিতরে না ঢুকে গুহামুখে দাঁড়িয়েই হাঁক ছাড়ল মুসা, 'অ্যাই জিনা, চলে এসো! আমরা বাইরে!'

প্রায় উড়ে চলে এলো জিনা।

'বেরোবার রাস্তা পেয়েছ তা হলে! বাব্বাহ্, বাঁচা গেল! অন্য মুখটা কোনদিকে?'

'সব বলছি—আগে ওই পাথরটার ওপর বসি, চলো,' বলল মুসা। সবাই বসতেই দুই পকেট থেকে দুটো অ্যাপ্‌ল্-পাইয়ের ক্যান বের করল ও।

'আরে! এগুলো কোথায় পেলে?' অবাক হল জিনা।

'গুহার শেষ মাথায়, সুন্দর করে সাজানো ছিল।' জিনা বিশ্বাস করছে না দেখে বলল, 'কসম খোদার, বিশ্বাস করো, সত্যি!'

'যাহ্!' সত্যি কি না বোঝার জন্য কিশোরের দিকে ফিরল জিনা। 'মিথ্যে কথা। তাই না, কিশোর?'

মাথা নাড়ল কিশোর হাসিমুখে। 'এগুলো কখন লোপাট করা হয়েছে জানি না, তবে কথাটা সত্যি। নাও, নথি, শুরু করো তোমার বিবরণ।'

রবিনের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে

পড়ল জিনা। এই সুযোগে আবার একপেট হেসে নিল তিন গোয়েন্দাও। ওদিকে ক্যান দুটো খুলে ফেলেছে মুসা। ওর কাঁধ থেকে মাথা কাত করে দেখছিল এতক্ষণ কিকো, এবার মুসার বাহুতে এসে বসল, 'খাও, খাও। খাও তো, সোনা।'

সবাইকে মিষ্টি ভাগ করে দিল জিনা। নিজের ভাগটা তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে জিনাকে পা মুছে ঘরে ঢুকতে বলল কিকো। তারপর 'অহ্-হো!' করে ফাঁপা কাশি দিল একটা।

হঠাৎ সাগরের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, দেখো! দূরে একটা পাল তোলা নৌকা দেখা যাচ্ছে না? কার ওটা? নিশ্চয়ই নিকির নয়?'

সবাই দেখল নৌকাটা। 'তা হলে কি কাছে-পিঠে আরও কারও নৌকা আছে? খোঁজ নিতে হবে তো! ওরা সিদ্ধান্ত নিল, আগামী কালই খোঁজ নেবে। সম্ভব হলে খাতির জমিয়ে ফেলবে ওটার মালিকের সঙ্গে।

চার

পরদিন নাস্তার পর মলিফুফুর কাছ থেকে পিকনিক-প্যাকেট নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন সারাদিনের জন্য। নাস্তার আগেই

চট্ করে সেলার থেকে ঘুরে এসেছে কিশোর—দরজা দেখা যাচ্ছে না, সুন্দর করে সাজানো রয়েছে খালি কার্টনগুলো।

পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে ওদের বেরিয়ে যেতে দেখে ডরু কুঁচকে চেয়ে থাকল নিকি। আজ আর ওর পক্ষে ছেলেমেয়েদেরকে অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যেই একগাদা কাজ চাপিয়ে দিয়েছে ম্যাডাম।

জোর বাতাস বুকে ঠেলে সাগর-তীর ঘেঁষে পাথুরে রাস্তা ধরে চলল ওরা দক্ষিণে। আশা করছে, কোথাও কোনও খাঁড়িতে হয়তো দেখতে পাবে গতকালকের সেই নৌকাটা। সাগরের লোনা গন্ধ বাতাসে, ছলাত-ছলাত ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ, আকাশে হরেক পাখির নিঃশব্দ আনাগোনা, মিঠে রোদ—সবই ভাল লাগছে ওদের। উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে আড়াই ঘণ্টা চলার পরেও পাওয়া গেল না কোনও নৌকা—না সাগরে, না তীরে।

'ওই দেখো, ছোট্ট একটা খাঁড়ি দেখা যায়।' আঙুল তুলে দেখাল জিনা। 'চিক-চিক করছে বালি। চলো, ওখানে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার খোঁজা যাবে।'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল ওরা সৈকতে। বড় কয়েকটা পাথরের আড়াল পেয়ে সাগর এখানে প্রায় স্থির। দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়েই শার্ট খুলে পানিতে নামল মুসা। ওর দেখাদেখি একে-একে নেমে পড়ল সবাই। মুসা ভাল সাঁতরায়, ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিয়ে চলে গেল বেশ অনেকটা দূরে। সাগরের ভিতর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত এক কালো পাথর, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ওরই একটা খাঁজে উঠে বসল মুসা। উড়ে এসে ওর কাঁধে বসল কিকো।

হঠাৎ মুসার চোখে পড়ল নৌকাটা। পাথরের ঠিক ওপাশেই আরেকটা খাঁড়ি দেখতে পেল ও। সেখানেই ঢেউয়ের আওতার বাইরে টেনে তুলে রাখা হয়েছে নৌকাটাকে সৈকতে। এই পাথরের উপর উঠে ওদিকে না তাকালে ওই সৈকতটা কারও দেখবার উপায় নেই। পাড় ধরে ওরা যদি আরও দক্ষিণে চলে যেত, দেখতে পেত না ওটাকে–তিন দিক থেকে ঝুঁকে এসে ছোট্ট সৈকতটাকে আড়াল দিয়েছে পাথুরে পাড়। হ্যাঁ, সাগরে এই নৌকাটাই দেখেছিল ওরা গতকাল।

অবাক হয়ে শিস দিল মুসা। এবং সঙ্গে সঙ্গে বকা খেল কাকাতুয়ার। হাজার বার নাকি সে বারণ করেছে মুসাকে শিস দিতে। পাথর ডিঙিয়ে নৌকাটার কাছে চলে গেল মুসা। নিকির বোটের মত এটাতেও দুইজোড়া দাঁড় আর মাস্তুলে জড়ানো পাল আছে। ঝকঝকে, তকতকে সুন্দর বোট; নাম–সীগাল।

পাথরের উপর উঠে চেঁচিয়ে ডাকল মুসা সবাইকে।

'দেখে যাও! বোটটা এইখানে!'

একমিনিটে এসে হাজির হল বাকি তিনজন। একনজর দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'এইটাই দেখেছিলাম আমরা। কিন্তু এর মালিক কোথায়?'

'আগে এসো, "খাইয়া লই"–তারপর খুঁজে বের করা যাবে মালিককে,' বলল মুসা।

সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি করে খিদে লেগে গেছে সবারই। ফিরে এল ওরা এপাশের সৈকতে। কাপড় বদলে নিয়ে চিপে রোদে শুকাতে দিল ভেজা কাপড়। একটা চাদর বিছিয়ে ফেলল

জিনা। মলিফুফুর দেওয়া স্যান্ডউইচ আর চকোলেট দেওয়া পিঠে দেখে হাসি ফুটল মুসার মুখে। খাবার আয়োজন হচ্ছে দেখে খুশি হল কিকোও। সবার কাছ থেকে একটু-একটু প্রসাদ পেয়ে ভরে গেল ওর ছোট্ট পেট। খুশি হয়ে বকা দিল সবাইকে, ধুয়ে আসতে বলল হাত-মুখ।

তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠল সবাই।

তারপর শুরু হল মালিকের খোঁজ। দু-জন দু-জন করে গেল দুইদিকে। প্রথমে একটা সরু ঝর্না পেল কিশোর ও জিনা। ওটা ডিঙাতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'চলো, ঝর্নার ওদিকটা একটু দেখে যাই। সিগারেটের টুকরোটা দেখছ? কেউ আছে ধারে-কাছে।'

জিনা দেখল, ভিজে ফুলে উঠেছে একটা সিগারেটের টুকরো, নাচতে নাচতে চলেছে সাগরের দিকে।

কিছুদূর উঠে আসতেই পাহাড়ের একটা ফাটলে একটা জীর্ণ কুটির দেখতে পেল ওরা। তার কাছেই ঝোপের ওপর রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে একটা সাদা শার্ট।

মুখে দুই আঙুল পুরে ছোট্ট করে সিটি বাজাল জিনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এলো মুসার। কুটিরের কাছে এগিয়ে গেল জিনা আর কিশোর। গুন-গুন করে গান গাইছে ভিতরে কেউ।

দরজায় টোকা দেওয়ার আগেই খুলে গেল দরজা। ঘর থেকে বেরিয়েই ওদের দেখে হাঁ হয়ে গেল কুটিরবাসী। এরা দুজনও অবাক হয়ে দেখছে লোকটাকে। একনজর দেখেই লোকটাকে পছন্দ হল জিনার। গোলগাল, হাসি-খুশি মুখ; ঝকঝকে চোখে

বুদ্ধির দ্যুতি। বয়স পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ। লম্বা-চওড়া, শক্তিশালী লোক, ক্লিন-শেভড; মাথার চারদিক ঘিরে কুচকুচে কালো চুল, কিন্তু চাঁদিটা একেবারে ফরসা। পরিষ্কার বোঝা যায়–শিক্ষিত ভদ্রলোক।

'হ্যালো!' বললেন ভদ্রলোক ওদের ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে। 'কী ব্যাপার, তোমরা কোত্থেকে?'

'গতকাল আপনার নৌকাটা দেখেছি আমরা সাগরে। তাই আজ খুঁজতে বেরিয়েছি আপনাকে।'

'তাই নাকি? ভাল। কিন্তু তোমরা কে বলো তো?'

'আমরা নিউ ফোর্ট থেকে এসেছি,' বলল কিশোর। 'নামে আপনি হয়তো চিনবেন না। এখান থেকে দু'-আড়াই মাইল দূরের একটা ভাঙাচোরা দুর্গ ওটা একটা।'

'চিনি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আমি তো জানতাম, দুই বুড়ো-বুড়ি থাকেন ওখানে, আর ওঁদের আধা-ইন্ডিয়ান কাজের লোক।'

'ঠিক বলেছেন,' এবার আলাপে যোগ দিল জিনা। 'আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে। ডক্টর অ্যালবার্ট স্যামুয়েলসন আমার কৃষ্ণা হন। যদিও আমি ওঁর কে হই, তা উনি জানেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। ঝিক্ করে উঠল উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। ওঁর নির্মল হাসিটা ভাল লাগল কিশোরের।

'আমিও শুনেছি, সারাদিন ইতিহাস ঘাঁটেন পাগলা প্রফেসর।'

'সারারাতও!' বলল কিশোর। তারপর নিজেদের পরিচয় দিল: 'আমি কিশোর পাশা, এর নাম জিনা পার্কার। আমাদের আরও

দুই বন্ধু মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড খাড়ির ওপাশটায় খুঁজছে আপনাকে। আমরা সবাই লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচে থাকি।'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে দু-পা এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। 'আর আমি ডিক কার্টার।' আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি ওদের সঙ্গে। 'একাই থাকি আমি এই ভাঙা কুটিরে।'

এমনি সময়ে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে এইদিকে আসছে মুসা আর রবিন। মুসার কাকাতুয়ার দিকে অবাক হয়ে চাইলেন ভদ্রলোক, তারপর হাত বাড়ালেন সামনে। 'আমি ডিক কার্টার। তুমি নিশ্চয়ই মুসা আমান, আর তুমি রবিন মিলফোর্ড। গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' কিকোর দিকে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, 'আর তুমি? তুমি কে?'

'চুপ! একদম চুপ!' বিরক্ত কণ্ঠে ধমক মারল কিকো। 'নইলে ঘাড় মটকে দেব!' বলেই রাগী কুকুরের চাপা গর্জন ছাড়ল। ডিককে ভড়কে যেতে দেখে যার-পর-নাই খুশি হয়ে বলল, 'পাজি ছেলে, যাও, ঘুমাতে যাও!'

'দারুণ তো!' কিকোর বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন ডিক কার্টার। 'তুলনাহীন!'

'মনে হচ্ছে হঠাৎ করেই খুঁজে পেয়েছেন আপনি এই চমৎকার নিরালা কুটিরটা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ঠিক। একদম হঠাৎ। কদিন বিশ্রাম নেয়ার জন্যে চমৎকার জায়গা। তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'কিন্তু আসলে আপনি কী করেন?'

'আমি...' একটু ইতস্তত করে বললেন ভদ্রলোক, 'আমি একজন পক্ষিপ্রেমিক।'

'আরে, তাই নাকি!' লাফিয়ে উঠল রবিন। 'আমিও তো! এই জায়গাটা সত্যিই পাখির স্বর্গরাজ্য। এখানে এসে অনেক পাখি দেখেছি আমি, যেগুলো আগে কেবল বইয়ের পাতায় দেখেই খুশি থাকতে হয়েছে।'

এই বলে নতুন কী-কী পাখি দেখেছে গড়গড় করে বলতে শুরু করল ও। ওসব শুনতে শুনতে বিরাট একটা হাই তুলল মুসা। মন দিয়ে শুনছেন ডিক কার্টার, রবিনের উৎসাহ দেখে মজা পাচ্ছেন, কিন্তু নিজে তেমন কিছুই বলছেন না।

'ঠিক কী পাখি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন আপনি?' হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল রবিন।

একটু আমতা-আমতা করে বললেন ডিক কার্টার, 'ঠিক বলতে পারি না। আমার ধারণা দ্বীপগুলোতে দুর্লভ কিছু পাখি হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

'আমারও তাই ধারণা,' পশ্চিমে আঙুল তুলল রবিন। 'আমার তো মনে হয়, ওই আইল অভ ডিজাস্টারে লুপ্ত কোনও পাখিরও সন্ধান পেয়ে যেতে পারি।'

'সম্ভব,' বললেন ডিক।

'যাবেন?' আগ্রহে চকচক করছে রবিনের চোখ। 'আর যদি যান, আমাদের নেবেন সঙ্গে?'

'তোমাদের সঙ্গে নিলে তো ভালই লাগবে আমার। যাওয়ার ইচ্ছেও আছে, কিন্তু শুনেছি ওই দ্বীপটার চারপাশে নাকি প্রচুর

ডুবো-পাহাড় আছে, কাছে যাওয়াই যায় না।'

'আশেপাশে যেতে তো আর অসুবিধে নেই,' বলল জিনা। 'কিকির একটা বোট আছে, কিন্তু ওটার কাছেও যেতে দেয় না আমাদের, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাকানোও বারণ। অথচ নৌকোয় করে বেড়াতে আমাদের খুব ভাল লাগে, আর মাছ ধরার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে আপনার নৌকায় যদি নেন আমাদের, আমরা কৃতার্থ হয়ে যাব।'

'প্লিজ!' বলল মুসা। 'আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা এই আশাতেই।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে!' রাজি হয়ে গেলেন ডিক কার্টার। 'অত সাধাসাধি করলে আবার পায়া ভারী হয়ে যাবে আমার। অলরাইট, মাঝে-মাঝে তোমাদের নিয়ে নৌকায় করে বেড়ানো যাবে, মাছও ধরব আমরা। ঠিক আছে? এবার খুশি?'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ওরা চারজন। জংলী নাচ দেখিয়ে দিল মুসা একটু তিড়িংবিড়িং নেচে।

ডিককে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বলল কিকো, দরজা পটকাতে নিষেধ করল। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মিষ্টভাষী, অমায়িক ভদ্রলোক।

পাঁচ

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ডিক কার্টারের সঙ্গে দারুণ খাতির জমে গেল ওদের। হাসিখুশি, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাব রয়েছে ভদ্রলোকের মধ্যে, যার ফলে ওরাও সহজেই আপন করে নিতে পেরেছে তাঁকে। রোজ একবার করে তাঁর ওখানে যাওয়া চাই-ই চাই। তৃতীয় দিনেই ওরা তাঁকে আঙ্কেল ডিক বলে ডাকতে শুরু করেছে। এখন কিকোও ডাকে ওই নামেই।

প্রায় রোজই এখন ওরা আঙ্কেল ডিকের সঙ্গে বোটে করে মাছ ধরতে যাচ্ছে, বড়বড় মাছ বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছানাবড়া করে দিচ্ছে নিকির চোখ। ডিকের নির্দেশনায় নৌকার হাল ধরা, দাঁড় বাওয়া, পাল টাঙানো রপ্ত হয়ে গেছে ওদের। ওরা নিজেরাই এখন নৌকা চালানোর দায়িত্বে থাকে, নোঙর তোলা, ফেলা—সব এখন ওদের কাছে জলবৎ তরলং। আঙ্কেল ডিক কেবল নৌকায় চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখেন আর আনমনে সিগারেট টানেন।

'নিকির চেহারাটা দেখেছিলে কাল?' হঠাৎ হেসে উঠল জিনা। 'আমরা যখন ইয়া বড় মাছ দুটো নিয়ে ঘরে ঢুকলাম?'

'হুঁ,' বলল কিশোর। 'তার চেয়েও ইন্টারেস্টিং ওর বিড়বিড়

করে বলা কথাগুলো। বলল: অসম্ভব! পাড়ে পাথরের ওপর বসে এ-মাছ ধরতেই পারে না। বোট নিয়ে সাগরে গেছিল ওরা।'

'তোমরা কি বলে দিয়েছ ওকে?' চট করে জিজ্ঞেস করলেন ডিক।

'পাগল!' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। 'আমাদের সব আনন্দ মাটি করবে তা হলে বিশ্রী, বেয়াড়া ওই বাজে লোকটা।'

'তোমাদের মলিফুফু আর অ্যালবার্ট ফুফা কি জানেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমাদের?'

এবার মাথা নাড়ল জিনা। 'নাহ্!' একটু ভেবে বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনি চান না ওঁদের বলি। কী অসুবিধে ওঁরা জানলে?'

চকচকে চাঁদিটা চুলকালেন আঙ্কেল ডিক, বললেন, 'আমি এখানে চুপচাপ কটা দিন নির্জনে কাটিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা বাচ্চারা আসছ, ভাল লাগছে আমার; কিন্তু আমি কিছুতেই চাইব না বড়রা কেউ এসে আমাকে ডিসটার্ব করুক।'

সেইল-বোট ছাড়াও ডিক কার্টারের ছোট্ট একটা সুন্দর গাড়ি আছে। লেটেস্ট মডেলের হোন্ডা। সেটা রাস্তার পাশে একটা আড়াল মত জায়গায় তেরপল দিয়ে ঢাকা থাকে সব সময়। ওতে চড়ে প্রায়ই শহরে যান তিনি এটা-ওটা কিনে আনতে। ছেলেমেয়েদের অনুরোধে রাজি হয়েছেন আগামীবার যখন শহরে যাবেন, ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

'কী কিনবে শহরে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন আঙ্কেল ডিক। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গেছেন তিনি ইতিমধ্যেই। ওর বড়সড় মাথাটার মধ্যে যে ক্ষুরধার একটা মস্তিষ্ক সারাক্ষণ

কাজ করছে, চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণ চলছে প্রতিটি কথা ও কাজের, অথচ বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই: এটা টের পেয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছেন ওকে ডিক কার্টার, এবং প্রতিভাবান ছেলেটিকে নিজের অজান্তেই জায়গা দিয়ে ফেলেছেন অন্তরে।

'রবিন কিনবে ওর ক্যামেরার জন্যে ফিল্ম, জিনারও কেনাকাটা আছে, মুসা নিকোর জন্যে কিনবে সূর্যমুখীর বিচি, আমি কিনব ছোটখাট একটা শক্তিশালী টর্চ। বার কয়েক অনুরোধ করার পরও, শহরে গেছে, কিন্তু ওগুলো আনেনি নিকি—প্রতিবারই ফিরে এসে টাকা ফেরত দিয়েছে, বলেছে: বেমালুম ভুলে গেছি।'

'টর্চ কেন?'

'আপনাকে সুড়ঙ্গের গল্প তো শুনিয়েছে রবিন। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার ধারণা, শীঘ্রিই ওই পথটা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে আমাদের আবারও। টর্চ থাকলে অনেক সুবিধে হবে।'

'ঠিক বলেছ,' বলল মুসা। 'আমিও একটা কিনব। অবশ্য, যদি আঙ্কেল নেন আমাদের।'

'বেশ,' হাসলেন ডিক। 'কাল তা হলে ঠিক দশটায় চলে এসো তোমরা, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

পরদিন ঠিক সময় মত এসে হাজির হল চার বন্ধু। খুশিতে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। গাড়িতে উঠে বসে জিনা বলল, 'ওহ্, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি—নিকিও যাচ্ছে আজ শহরে। দেখা হয়ে গেলে মজাই হবে, কপালে উঠবে ব্যাটার চোখ।'

ড্রাইভিং সীট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেন ডিক কার্টার। 'আমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে, এটা যেন প্রকাশ না পায় কিছুতেই। খেয়াল থাকবে তো?'

'থাকবে,' কথা দিল জিনা। তারপর বলল, 'আপনার গাড়িটা তো দারুণ! একেবারে ব্র্যান্ড নিউ! এই রাস্তাতেও টের পাওয়া যাচ্ছে না ঝাঁকি। মনে হচ্ছে পক্ষিরাজে চড়ে চলেছি!'

শহরে পৌঁছে গাড়িটা পার্ক করে রেখে তালা দিলেন ডিক কার্টার। ওদের বললেন, 'তোমরা যে-যার বাজার সারো, আমি নিজের কাজে যাচ্ছি। ঠিক একটার সময় লাঞ্চ করব আমরা গ্র্যান্ড হোটেলে।'

'ঠিক আছে, লাঞ্চের পর সবাইকে আইসক্রিম খাওয়াব আমি,' বলল জিনা। 'দেখা হচ্ছে তা হলে একটায়।'

লম্বা পা ফেলে লোকের ভিড়ে মিশে গেলেন ডিক।

'মানুষটা কী কাজ করেন জানা গেল না আজ পর্যন্ত,' বলল রবিন।

'অরনিথোলজিস্ট যে না, সেটা আমি লিখে দিতে পারি,' বলল কিশোর। 'রবিনের চেয়েও কম জানেন ভদ্রলোক পাখি সম্পর্কে। কী এক রহস্যময় গোপনীয়তা রয়েছে আচরণের সব কিছুতে।'

খোঁজাখুঁজি করে একটা দোকানে পাওয়া গেল মনের মত পকেট টর্চ। একটা স্টুডিও থেকে থার্টিফাইভ মিলিমিটার ফিল্ম কিনল রবিন দুই রীল। সীডস্টোর থেকে কিকোর জন্য কেনা হল সূর্যমুখীর বিচি। কেক বিস্কিট কিনল জিনা, নিজের জন্য কয়েকটা রুমাল আর মলিফুফুর জন্য কিনল ছোট এক শিশি সেন্ট।

ব্যস, ছোট মানুষ ওরা, আর কত শপিং করবে। একটা বাজবার অপেক্ষায় এবার দোকানে-দোকানে ঘুরবে বলে স্থির করল ওরা। এটা-ওটা দেখতে দেখতেই একটা কমদামি বিনকিউলার কিনে ফেলল রবিন। পাখি দেখতে সুবিধে হবে।

এই দোকান থেকে বের হয়েই দেখতে পেল ওরা, ধ্যাদ্ধেড়ে গাড়িটা চালিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নিকি মন্টিয়ানো। হাসিমুখে এ-ওর পাঁজরে গুঁতো দিল কনুই দিয়ে। কিন্তু হাসি মুছে গেল ঠোঁট থেকে, যখন হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চাইল নিকি।

জিনার উপর চোখ পড়ল ওর প্রথমে, তারপর দেখতে পেল মুসার কাঁধে বসা কিকোকে। এতই বিস্মিত হল যে আরেকটু হলে চাপা দিয়ে ফেলছিল ট্রাফিক পুলিশকে।

'এই-যে, এই! কোনদিকে চেয়ে গাড়ি চালাও?' রেগে গিয়ে ধমক মারল ট্রাফিক পুলিশ।

নিচু গলায় ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার চাইল নিকি ওদের চারজনের দিকে।

'দৌড় দিয়ো না,' বলল কিশোর। 'ধীরে-সুস্থে হাঁটো, যেন দেখিইনি আমরা ওকে। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি রেখে তো আর আমাদের তাড়া করতে পারবে না।'

নিকির চিৎকারে কান না দিয়ে, যেন গল্পে মত্ত হয়ে আছে এমনি ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল ওরা গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না নিকি। ওরা শহরে এল কী করে? বাস নেই, ট্রেন নেই; বাইসাইকেল থাকলে তা-ও একটা কথা ছিল, কিন্তু নেই। তা হলে? হেঁটে যে এখানে পৌঁছে

যাবে, এত কম সময়ে, সেটাও সম্ভব নয়। কী করে এল?

গাড়িটা তাড়াহুড়ো করে পার্ক করেই ছুটল নিকি তিন গোয়েন্দা আর জিনার পিছনে। কিন্তু ও বিশ গজ পিছনে থাকতেই ওকে তাজ্জব করে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা গ্র্যান্ড হোটেলের রঙীন কাঁচের দরজার ওপাশে।

এলাকার সেরা, অভিজাত হোটেলের ভিতর ওদেরকে তাড়া করে ধরবার সাহস হল না নিকির। স্থির করল, রাস্তার ধারে সিঁড়ির উপর বসেই অপেক্ষা করবে ওদের জন্য। বেরোলেই ধরে নিয়ে যাবে ম্যাডামের কাছে। হোটেলে খাওয়া বের করবে ওদের ম্যাডাম যখন শুনবে সব।

দোতলার লাউঞ্জে ওদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন ডিক কার্টার। হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

'এত হাসি কীসের?' সবাই একটা টেবিল ঘিরে বসতেই জানতে চাইলেন ডিক। সব শুনে বললেন, 'থাক ওখানে বসে। ব্যাটা ঘোল খাবে আজ।'

অর্ডার দেওয়াই ছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে একে-একে আসতে শুরু করল হরেক রকম খাবারের ডিশ। কানে গিয়ে ঠেকল মুসার হাসি। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠে জিনাকে মনে করিয়ে দিল সে আইসক্রিমের কথা। বাধা দিলেন ডিক কার্টার।

'আরেকদিন খাব আমরা জিনার আইসক্রিম। আজকেরটার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আমি আগেই।'

বলতে না বলতেই প্রত্যেকের জন্য বড় বাটিতে করে এল থ্রি-ইন-ওয়ান আইসক্রিম। বাদামের কুচি ও মধু দেওয়া রাসবি,

পাইন্যাপল্ আর ভ্যানিলা। ওগুলো এসে পৌছতে সবাই চামচ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল বিক্রমে।

খাওয়ার পাট চুকে যেতেই রবিন উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল এখনও নিকি আছে কি না। বলল, 'আছে, সিঁড়ির ধাপে বসে কান পরিষ্কার করছে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে।'

'করুক,' লাঞ্চের বিল মিটিয়ে দিয়ে বললেন ডিক। 'চলো, আমরা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

আঙ্কেল ডিকের পিছন-পিছন হোটেলের ব্যাকডোর দিয়ে বেরিয়ে চলে এল ওরা গাড়ির কাছে। ঘুরপথে গিয়ে উঠল নিউ কোর্টে যাওয়ার পাহাড়ি রাস্তায়।

দুর্গের খুব কাছে ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন আঙ্কেল ডিক। দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলো ওরা। জামা পালটে চলে গেল সাগর-তীরে, ওদের প্রিয় পাথরটার উপর বসে মেতে গেল দাবা খেলায়—খেলছে দুজন, বাকি দুজন উপদেষ্টা।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল নিকি। ভ্রু কুঁচকে, পেশিবহুল দুই হাত বুকে বেঁধে দাঁড়াল ওদের থেকে একটু তফাতে। সিদ্ধান্ত নিল, এসবের রহস্যটা কোথায়, বের করবে সে যেমন করে হোক। চারটে পিচ্চি ওকে বারবার বোকা বানাবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কিছুতেই না।

ছয়

অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছল নিকি: অনুসরণ করতে হবে। শহরে যাওয়া এবং ওকে ফাঁকি দিয়ে ওর আগেই এখানে ফিরে আসার মধ্যে আর কোনও রহস্য নেই; জানা কথা, কেউ গাড়িতে করে নিয়ে গেছে এবং পৌঁছে দিয়েছে ওদের। কিন্তু কে সে? সেটা জানতে হলে সারাক্ষণ লেগে থাকতে হবে ওদের পিছনে। নিশ্চয়ই সেই লোকটাই মাছ ধরতে নিয়ে যায় ওদেরকে বোটে করে। যেমন করে হোক জানতে হবে তার পরিচয়।

দুই দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জিনা। নিকিকে খসানো যাচ্ছে না কিছুতেই। ওরা যেখানেই যাক না কেন, আঠার মত ওদের সঙ্গে লেগে থাকে সে সারাক্ষণ। কিছুতেই আঙ্কেল ডিকের ওখানে যেতে পারছে না ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে।

মুসা বুদ্ধি দিল, 'এসো, আমরা চারজন চারদিকে হাঁটতে থাকি। একই সঙ্গে তো আর সবার পিছু নিতে পারবে না ও-নিকি ব্যাটা যার সঙ্গে লেগে থাকবে সে ছাড়া বাকি তিনজন দেখা করে আসব আঙ্কেলের সঙ্গে।'

'তার চেয়েও ভাল একটা বুদ্ধি আছে,' বলল কিশোর। জিনার

দিকে ফিরল ও, 'আগামীকালও যদি আমরা পিকনিক করতে চাই, মলি আন্টি কি বিরক্ত হবেন?'

'আমার মনে হয় না,' বলল জিনা।

'তা হলে কাল নাস্তার পর লাঞ্চ-প্যাকেটের কথা বলব তাঁকে। কিন্তু খবরদার, নিকি যেন জানতে না পারে।'

'ওকে ফাঁকি দেবে কী করে? তোমার প্ল্যানটা কী?'

'কাল বলব, ওটাকে মনে মনে আরও একটু গুছিয়ে নিই আগে, তারপর।'

কেউ আর চাপাচাপি করল না। সবাই জানে, উপযুক্ত সময়ের আগে মুখ খোলানো যায় না কিশোরের।

যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিন নাস্তা খেতে গিয়ে মলিফুফুর অনুমতি নিল ওরা—আজও লাঞ্চ খেতে চায় বাইরে, ফিরবে বিকেলে।

'নিশ্চয়ই!' বললেন তিনি। 'বেড়াতে এসে ঘরে বসে থাকা কী! ছুটিতে রোজ পিকনিক করলেও কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক এগারোটায় এই টেবিলে তৈরি থাকবে প্যাকেট করা লাঞ্চ।'

খুশি মনে চলে গেল ওরা টাওয়ার-রুমে।

'এইবার শোনা যাক তোমার প্ল্যানটা,' বলল মুসা। 'আমি জানি, যেখানে যাই না কেন, সব কাজ ফেলে বদমাশটা সেখানেই যাবে আমাদের পিছু-পিছু।'

'চাইলেও পারবে না,' বলল কিশোর। 'তার ওপর আজ ওর কপালে ঝুলছে মলি আন্টির কড়া একখান দাবড়ি।'

'খুলে বলবে, না কি আমাদেরকে আঁধারে রেখে মজা পেতে

চাও?' রেগে যাচ্ছে জিনা।

'বলছি, বাবা, বলছি। দশটার দিকে চলে যাব আমরা সৈকতে নিকির বোটের কাছে। ওর নৌকার গা ঘেঁষে বসে ষোলো গুটি খেলব।'

'ষোলোগুটি আবার কী?'

'একটা বাংলাদেশী খেলা,' বলল কিশোর। 'আমি শিখিয়ে দেব। তারপর শুরু করব কেভ এক্সপ্লোরেশন। একসময় সবাই ঢুকব আমাদের গোপন ওই সুড়ঙ্গে। কখন বের হব সেই আশায় বসে থাক ব্যাটা গুহামুখের পাহারায়। বুঝতে পেরেছ প্ল্যানটা?'

'হ্যাঁ!' একসঙ্গে বলে উঠল মুসা ও রবিন।

'ওদিকে আমরা সেলার হয়ে কিচেনে উঠে বেরিয়ে যাব বাইরে!' হাততালি দিল জিনা। 'দারুণ মজা হবে!'

ঠিক দশটায় চলল ওরা সাগর-সৈকতের দিকে। কিকোর বকা-ঝকায় কোনও কাজ হল না, খেতের কাজ ফেলে ওদের পিছু নিল নিকি। প্রথমে নিকির গা জ্বালিয়ে দিয়ে খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওর নৌকাটা দেখল ওরা কিছুক্ষণ। কিকো উড়ে গিয়ে বসল ওটার গলুইয়ে, বিষ্ঠা ত্যাগ করল ঝকঝকে নৌকার ভিতর। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখল নিকি, কিছু বলল না।

তারপর ছোট দেখে ষোলোটা শামুক আর ষোলোটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে বালির উপর দাগ টেনে ষোলোগুটি খেলল ওরা আধ ঘণ্টা। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল নিকি, কী-খেলে দেখবে।

'ওই দেখো! শিখে ফেলছে!' বলল কিশোর অভিযোগের

সুরে। 'নাহ্, এর জ্বালায় তো কিছু খেলাও যাবে না দেখছি!'

বালিতে কাটা ছক মুছে দিয়ে উঠে পড়ল ওরা। এবার একের পর এক গুহায় ঢুকছে আর বেরোচ্ছে ওরা। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল নিকি। কোনও গুহায় পাঁচ মিনিট থাকছে ওরা, কোনটায় বিশ মিনিট। কিন্তু আসলটায় যখন ঢুকল, আর বেরোল না। আধঘণ্টা অপেক্ষা করে গুহার ভিতর উঁকিঝুঁকি মারল নিকি, কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে অপেক্ষা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। গুহামুখের কাছেই একটা পাথরে বসে থাকল পাহারায়।

ওদিকে অর্ধেক পথ গিয়েই ফাঁপর লেগে উঠল জিনার। বেঁকে বসল, আর যাবে না। বলল, দম আটকে আসছে ওর। তিন গোয়েন্দা অনেক বোঝাল: আর কিছুদূর এগোলেই কেটে যাবে খারাপ লাগাটা, কিন্তু টলানো গেল না ওকে। পিছন ফিরতে যাচ্ছে, এমনি সময়ে নিকির অনুকরণে 'অহ্-হো' করে কেশে উঠল কিকো। হঠাৎ জিনার মনে হল, গোপন পথটা খুঁজে পেয়ে বুঝি পিছু নিয়ে আসছে নিকি। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল ও, তর্ক রেখে দ্রুতপায়ে এগোল আবার। ওকে হোঁচট খেতে দেখে মুচকি হাসল মুসা।

'অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' বলল ও হাসিমুখে। 'ওটা কিকোর কাশি।'

'আর তুমি হাসছ বোকার হাসি!' রেগে গিয়ে বলল জিনা।

'বাহ্! বেড়ে বলেছ তো!' প্রশংসা ঝরল কিশোরের কণ্ঠে, 'মুসা আউট!'

ধাপ কটা ডিঙিয়ে পৌঁছে গেল ওরা ট্র্যাপডোরের নীচে। এবার

আর তেমন শক্তি লাগল না, একজনের ঠেলাতেই উঠে গেল তক্তাটা। প্রথমে উঠল মুসা, তারপর একে একে টেনে তুলল সবাইকে। নামিয়ে দিল তক্তা।

গোপন সেলারে তালা নেই, দরজায় ঠেলা দিতেই হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল খালি কার্টনগুলো। রবিন চট্ করে দেখে এল, কিচেনে কেউ নেই। অন্যেরা ততক্ষণে দরজার সামনে ঝট্‌পট্ সাজিয়ে ফেলেছে কার্টনগুলো।

টেবিলে সাজানো লাঞ্চ-প্যাকেট ভরে নিল ওরা পিঠে ঝোলানো ব্যাগে। মলিফুফুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গ থেকে ঠিক যেন উড়ে বেরিয়ে গেল ওরা মুক্ত বিহঙ্গের মত।

নৌকাটার কাছে পেল ওরা আঙ্কেল ডিককে। ওদের দেখেই হাত নাড়লেন, 'কী ব্যাপার, গত দু-দিন এলে না যে? ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে পশ্চিমের ওই দ্বীপটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসব।'

'অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারলাম না, আঙ্কেল,' বলল রবিন। 'ওই নিকিটা লেগে গেছে আমাদের পেছনে; ওর সন্দেহ, গাড়ি আছে এমন কারও সাহায্য পাচ্ছি আমরা। ও দেখতে চায়, কে সেই লোক।'

'ওকে কিছু বোলো না আবার,' বললেন ডিক কার্টার। 'আমি চাই না ও আশেপাশে ঘুর-ঘুর করুক। লোকটাকে আমার মোটেও ভাল বলে মনে হচ্ছে না।' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে ফাঁকি দিলে কী করে?'

সব খুলে বলল ওরা আঙ্কেলকে। শুনে মৃদু হাসি ফুটল তাঁর

ঠোঁটে। তারপর বললেন, 'বাহ্! বকা খাওয়াবার জন্যে আসার সময় ফুফুর সঙ্গে দেখাও করে এসেছ! নিশ্চয়ই কিশোরের বুদ্ধি?' চোখ মটকালেন, 'কী, যাবে নাকি আজ? ভাবছি আইল অভ ডিজাস্টারের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসব।'

সবাই একবাক্যে রাজি। দেরি না করে নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেল সীগাল। পাথর এড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে সরে এসেই আঙ্কেল ডিক বললেন, 'আজ তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যাক একটা। দেখি, এই কদিনে কে কতটা শিখেছ। প্রথমে রবিন আর মুসা দাঁড় বাও, জিনা হাল ধরো।' বিশ মিনিট পর খুশি হয়ে বললেন, 'বাহ্, ভাল ছাত্র দেখছি! এবার কিশোর আর মুসা পালটা তোলো, হাল ধরো রবিন।'

ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে খুশি হলেন আঙ্কেল।

ওদিকে একঘণ্টা অপেক্ষা করে আতঙ্কিত নিকি ফিরে এল নিউ কোর্টে। কিচেনে গিয়ে মলিফুফুকে জানাল ছেলেমেয়েরা হারিয়ে গেছে।

'হারিয়ে গেছে মানে?' ভুরু নাচালেন ফুফু।

'ওরা একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে প-প্পথ হারিয়ে ঘুঘ্-ঘুরে মরছে ওর ভেতর!'

'কখন?' একটু ঘাবড়ে গেলেন মলিফুফু। 'কখন ঢুকেছে ওরা সুড়ঙ্গে?'

'এই তো, দে-দেড়ঘণ্টা আগে। ঢুঢ্-ঢুকল, কিন্তু...'

'রাখো তোমার ফালতু কথা। তুমি কী করছিলে এতক্ষণ শুনি? সেই সকাল থেকে ডেকে-ডেকে পাচ্ছি না। কোথায় ছিলে?'

'ওদের বে-বেরোবার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কি-কিন্তু একটু আগে ঢুকে দেখি...'

'মিছে কথার আর জায়গা পাও না, না? খালি কাজে ফাঁকি দেয়ার তাল! এখন আজগুবি এক গপ্পো বানিয়ে এনেছে আমাকে শোনাতে!'

'ম্যাডাম, আমি নি-নিজের চোখে...'

'রাখো তোমার নিজের চোখ! এই তো, বিশ মিনিটও হয়নি ওরা আমার কাছ থেকে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে চলে গেল পিকনিকে। যাও, ওদের দুঃখে কলজে না ফাটিয়ে কাঠগুলো ফাটিয়ে চেলা করো গিয়ে। এমন অলস লোক আর দেখিনি, বাবা! কাজ ফাঁকি দেয়ার ওস্তাদ একটা!'

ধমক খেয়ে মুখ চুন করে চলে গেল নিকি কাজে। কী করে কী ঘটল বুঝতে পারছে না কিছুতেই। বিশ মিনিট আগে ওরা লাঞ্চ প্যাকেট নেয় কীভাবে? পাগল হয়ে গেছে ম্যা-ম্যাডাম?

দোলা পশ্চিম দিকে ছুটছে ওদের বোট। তরতর করে চলেছে নাক বরাবর আইল অভ ডিজাস্টারের দিকে। শান্ত সাগরে মৃদু দোলা।

'পারছি আমরা, আঙ্কেল? পাশ?' জানতে চাইল মুসা।

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল। 'মনে হচ্ছে, আমি না থাকলেও তোমরা ঠিকই চালাতে পারবে এটাকে।'

'মাঝে মাঝে 'সীগাল'কে নিয়ে বেড়িয়ে আসতে দেবেন আমাদের?' জানতে চাইল রবিন।

'হয়তো। আবহাওয়া ভাল থাকলে,' বললেন ডিক। 'আর

তোমরা যদি কথা দাও বেশি দূরে যাবে না।'

'আঙ্কেল ডিক, ঠাণ্ডা আসছে! দরজাটা বন্ধ করো!' মাস্তুলের আগায় বসে ধমক দিল কিকো। বাতাসে ভারসাম্য বজায় রাখতে পাখাদুটো একটু ছড়িয়ে রেখেছে। মহানন্দে আছে সে। 'গাধা কোথাকার! পা মুছে ঘরে ঢোকো! কতবার বলেছি তোমাকে?'

'অ্যাই, কিকো, বেয়াদবি করে না!' বলল রবিন।

হা-হা করে খল-নায়কের মত অট্টহাসি হেসে বাতাসে ভাসল কিকো। রুমাল কোথায় জিজ্ঞেস করে চমকে দিল একজোড়া সীগালকে। তারপর আরেক জোড়াকে টানেলের ভিতর কার ট্রেনের বিকট আওয়াজ শুনিয়ে ওদের জ্ঞান উড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল মাস্তুলের আগায়:

'কই, আইল অভ ডিজাস্টার তো দেখতে পাই না!' নতুন কেনা বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে বলল রবিন। কিন্তু পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! ওই তো, দ্বীপটা! সবাই দেখতে পাচ্ছ?'

'কী করে পাব?' বললেন ডিক। 'আমাদের চোখ তো আর দূরবীন নয়!'

বিনকিউলারটা এগিয়ে দিল রবিন। দ্বীপটা বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে ওটা ফেরত দিলেন ডিক। 'বেশ বড়সড় দ্বীপ মনে হচ্ছে! খুব বিপজ্জনকও!'

ছোটরা সবাই উত্তেজিত। এগিয়ে চলেছে বোট। খালি চোখেই এখন দেখতে পাচ্ছে সবাই অশুভ দ্বীপটা। চারপাশের পানিতে তুমুল তোলপাড়, আলোড়ন। চোখা, অমসৃণ পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে শন্যে উঠছে পানি, দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে লক্ষ

কোটি জলকণা, তৈরি করেছে কুয়াশার মত একটা আবহ।

আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে এখন পাহাড়ী দ্বীপের কিছু-কিছু অংশ। ছোট-ছোট কয়েকটা গাছও দেখা গেল—বাড়ন্ত নয়, ন্যাকাচোরা। কেমন একটা ভয় ধরায় মনে।

'দূর থেকে একটা চক্কর মারব,' বললেন আঙ্কেল ডিক। 'তোমরা খেয়াল রেখো পাথরের ফাঁক গলে ল্যান্ড করার মত কোন রাস্তা দেখা যায় কি না।'

'পথ থাকলে ওঠা যাবে দ্বীপে, তাই না?' বলল উৎসাহিত রবিন। 'আমার ধারণা, এখানকার পাখিগুলো মানুষকে ভয় পাবে না মোটেও, ক্লোজ-আপ ছবি তোলার জন্যে তিন ফুটের মধ্যে যেতে দেবে আমাকে।'

'হয়তো দেবে, হয়তো না,' বললেন আঙ্কেল। 'কিন্তু কারও খাতিরেই ল্যান্ড করব না আমি এই দ্বীপে। তোমাদেরকে নিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা এই পানিতে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ডুবতে রাজি নই আমি।'

হাল এখন ডিক কার্টারের হাতে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যতটা সম্ভব তীর ঘেঁষে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বোটটা। বিনকিউলার চোখে মুসার দখলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ও, 'আরে! কয়েকটা গাছপালা দেখা যাচ্ছে! এখানে এখনও কেউ বাস করে নাকি?'

'মনে হয় না,' বললেন ডিক কার্টার। 'এক-দেড়শো বছর আগে থেকেই বিরান হয়ে গেছে এই দ্বীপ।'

'নাকি ভূত-প্রেত এক-আধটা দেখতে পাচ্ছ না?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'জ্বি-না.' ফিল্ডগ্লাসটা কিশোরের হাতে দিয়ে বলল মুসা। 'তুমি নামলে হয়তো দেখতে পেতাম!'

দ্বীপের পশ্চিম দিকটা ঘুরবার সময় হঠাৎ রবিনের চোখে পড়ে গেল ল্যাণ্ড করবার সম্ভাব্য পথটা। এদিকে ঢেউয়ের মাতম কিছুটা কম। পাথরের ফাঁকে বেশ কিছুটা জায়গা অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ।

'আমি বাজি রাখতে পারি, এটাই দ্বীপে ওঠার একমাত্র রাস্তা!' উত্তেজনা চাপতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল ও।

কোনও কথায় কান দিলেন না আঙ্কেল ডিক। দ্বীপ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন। কিছুদূর গিয়ে পাল নামিয়ে নিয়ে বোটটাকে যেদিক খুশি ভাসতে দেওয়া হল। লাঞ্চ প্যাকেট খুলে সবাইকে খাবার ভাগ করে দিল জিনা। ডিক কার্টারের আনা বিস্কিটও ভাগাভাগি করে নিল সবাই।

'ব্যাপার কী!' অবাক হয়ে জিনার দিকে চাইলেন আঙ্কেল ডিক। 'মুসার ভাগে অত বেশি কেন?'

'ও তো মানুষ না!' জবাব দিল জিনা।

মুচকি হেসে কিশোর বলল, 'ওর সঙ্গে ওর পার্টনার কিকো আছে না? ওটা দুজনের ভাগ!'

কিকোকে সূর্যমুখীর বিচি দিয়ে নিজেই চেটেপুটে সবটুকু খেয়ে উঠল মুসা। আঙ্কেলের ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিল চা।

'শাব্বাশ!' বলে মুসার পিঠে দুটো প্রশংসার চাপড় দিলেন আঙ্কেল। 'এবার একটু জিরিয়ে নিয়ে দাঁড়টা ধরো দেখি। পাল তুলব না আজ আর।'

'দূর থেকে দেখা যাবে বলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চট্ করে ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন আঙ্কেল, তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক বলেছ।'

সবাই মিলে পালা করে দাঁড় বেয়ে ফিরে এল ওরা আঙ্কেলের ডেরায়।

ডাঙায় নেমে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'সত্যিই কি আপনি বোটটা আমাদের চালাতে দেবেন, আঙ্কেল ডিক?'

'যদি তোমরা কথা দাও দূরে যাবে না। বিশেষ করে পাখির ছবি তুলতে আইল অভ ডিজাস্টারের দিকে যাবে না।'

মনে মনে সেটাই ইচ্ছে ছিল রবিনের, ধরা পড়ে লাল হয়ে গেল ওর চেহারা। সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, আপনার বোট নিয়ে আমরা ওই দ্বীপের দিকে যাব না। তা হলে একা আমাদের হাতে ছাড়বেন ওটা?'

'হ্যাঁ, ছাড়ব। বোট চালানো ভালই রপ্ত করেছ তোমরা। দিনটা যদি ভাল হয়, বেশি দূরে না গেলে বিপদের আশঙ্কা নেই।'

খুশি হল রবিন। মনে-মনে একটা প্ল্যান এঁটে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। এই বোট চালিয়ে ওরা আরও কিছুটা রপ্ত করে নেবে পাল তোলা, দাঁড় বাওয়া আর হাল ধরার কৌশল, তারপর নিকির বোট চুরি করে রওনা দেবে ওই দ্বীপের উদ্দেশে। পাখির কয়েকটা মোক্ষম ছবি ওর চাই-ই চাই।

'অনেক ধন্যবাদ, আঙ্কেল,' বলল কিশোর। 'চমৎকার কাটল দিনটা। গুড বাই!'

'নিকির নজর এড়িয়ে সম্ভব হলে কাল আবার এসো। ইচ্ছে করলে বোটটা নিতে পারবে তোমরা।'

সবাই আঙ্কেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা দিল নিউ ফোর্টের পথে। দুর্গের কাছাকাছি আসতেই ধরল ওদের নিকি।

'কোথায় গি-য়েছিলে তোমরা? আর আমার চো-চ্চোখ ফাঁকি দিয়ে গুহা থেকে বে-ব্বেরোলেই বা কখন?'

'কেন, তোমার সামনে দিয়েই তো বের হলাম,' বলল জিনা। 'কিন্তু এতো প্রশ্ন কেন? তুমি কি আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে চেয়েছিলে, নিকি?'

ভুরুজোড়া কুঁচকে অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে রইল নিকি, মুখে আর কিছু বলল না। মনে-মনে বলল: দাঁড়াও, তোমাদের চালিয়াতি বের করছি আমি!

সাত

খেপে গেছে রবিন। পাখির ছবি সে তুলবেই। এবং সেজন্য ওই অশুভ দ্বীপটায় যেতেই হবে ওকে।

আঙ্কেলের বোট নিয়ে প্র্যাকটিস করে কয়েক দিনেই হাত পাকিয়ে ফেলল ও নৌকা চালনায়। ওর চাপাচাপিতে ভাল মত রপ্ত হয়ে গেল কিশোর, মুসা আর জিনারও। এখন নিকির বোটটা চুরির একটা সুযোগ পেলেই হয়।

'ধরতে পারলে ও কিন্তু পিটিয়ে লাশ করবে আমাদের,' কিশোরকে সাবধান করল মুসা। 'বার বার ঠক খেয়ে রেগে ভূত হয়ে আছে আমাদের উপর। সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করবে।'

'ধরতে পারবে না,' বলল রবিন। মনস্থির করে ফেলেছে ও, এখন ওকে টলানো কঠিন। 'ও যেই গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে রওনা হবে, অমনি আমরা উঠব গিয়ে ওর বোটে। ঘণ্টা দুয়েকের বেশি কি লাগবে আমাদের? মনে হয় না।'

শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ওর ওই এক চিন্তা—কবে যেতে পারবে আইল অভ ডিজাস্টারে; রেযারবিল আর পাফিনের ঘাড়ে হাত রেখে ছবি তুলবে। দিনে-রাতে সুযোগ পেলেই ওর চোখ চলে যায় পশ্চিম দিকে।

কিন্তু একরাতে চমকে উঠতে হল ওকে। খোলা জানালা দিয়ে পশ্চিমে চেয়েই চোখে পড়ল ওর আলোর সঙ্কেত। প্রথমে মনে করল আলেয়ার আলো, কিন্তু একটু পরেই পরিষ্কার টের পেল মোর্স কোডে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে কেউ দ্বীপ থেকে। দ্বীপ থেকে, না কি দূরের কোনও জাহাজ থেকে? তারপরই দেখতে পেল, কাছেই সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে কে যেন উত্তরও দিচ্ছে সঙ্কেতের। কে লোকটা? দেখা দরকার তো!

একবার ভাবল কিশোর আর মুসাকে ডাকবে কি না। কিন্তু ওদের ঘুম না ভাঙিয়ে প্রথমে নিজেই তদন্ত করে দেখবার সিদ্ধান্ত নিল। জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে পা টিপে নামতে শুরু করল ও টাওয়ার-রুম থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। অর্ধেক নেমেছে, এমনি সময়ে দেখল গেট দিয়ে ঢুকছে নিকি, হাতে একটা টর্চ। সাগর-

তীরে বা পশ্চিমের সেই দ্বীপ বা জাহাজ থেকে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না আর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রবিন। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল নিকি, নিঃশব্দে উঠে এল রবিন টাওয়ার-রুমে।

কার সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করল নিকি মন্টিয়ানো? কেনই বা? না কি সবটুকুই ওর দৃষ্টিবিভ্রম? ভূতের ভয়ে আধমরা নিকি এত রাতে বাইরে বের হওয়ার সাহস পায় কোত্থেকে? কাল সকালেই ব্যাপারটা জানাতে হবে কিশোরকে।

ঘরে ঢুকতেই কিশোরের গলা শোনা গেল।

'কোথায় গেছিলে, রবিন?'

সব ঘটনা খুলে বলল রবিন। চুপচাপ শুনল কিশোর। উঠে গিয়ে খোলা জানালা দিয়ে দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'আমাদের জাগানো উচিত ছিল তোমার, রবিন। সঙ্গে অন্তে একটা টর্চও নাওনি। অন্ধকারে একা সাগর-তীরের পাহাড়ে গেলে নিকির হাতের এক ধাক্কায় মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। বিশেষ করে এই নিকি মন্টিয়ানোর ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকা দরকার।'

'কেন? বিশেষ করে ওর ব্যাপারে কেন?'

'কারণ, লোকটা ভাল নয়। প্রয়োজনে খুন করতেও পিছ-পা হবে না।'

পরদিন সব শুনে ঠিক একই কথা বললেন আঙ্কেল ডিক। সঙ্কেত আদান-প্রদানের ব্যাপারটা তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ ভাবাল। তারপর বললেন, 'সাবধান! নিকির ব্যাপারে খুব সাবধান! পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক তোমাদের ওই নিকি!'

*

সেইদিনই অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলে গেল সুযোগ। মলিফুফু জানতে চাইলেন, কারও কিছু লাগবে কি না, বাজারের লম্বা লিস্ট নিয়ে নিকি যাচ্ছে শহরে। ওরা জানে ফিরে এসে টাকা ফেরত দেবে নিকি, কিছু আনতে দেওয়ার কোনও মানে হয় না, তবু একজোড়া ব্যাটারি আর একটা ফিল্মের জন্য টাকা দিল মুসা ও রবিন।

জিনা অসম্ভব মাথা ধরায় বিছানায় শুয়ে কোঁকাচ্ছে, ওর কাছ থেকে আগেভাগেই বিদায় নিয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। গাড়িটা চোখের আড়াল হতেই পুলকিত চিত্তে ছুটল ওরা সৈকতে নোঙর করা নিকির বোটের দিকে। এটা আঙ্কেলের বোটের চেয়ে কিছুটা বড়। একটু বেশি ভারীও। ঝটপট নোঙর তুলে খুঁটিতে বাঁধা দড়ি খুলে ফেলল ওরা। আঙ্কেলের শেখানো কায়দায় দোল দিয়ে নামাল ওটাকে পানিতে। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড় তুলে নিল দুজন, হাল ধরল কিশোর।

দাঁড় বেয়ে বোটটাকে তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে তারপর পাল তুলল ওরা। তরতর করে ছুটল তরী সোজা পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দ্বীপটা দেখতেই পেল না ওরা। দেখবার আগেই শুনতে পেল পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার ঝপাস-ঝপাস শব্দ।

পালটা নামিয়ে ফেলতে বলল কিশোর। অনেক কাছে চলে এসেছে, আইল অভ ডিজাস্টার। দাঁড় বেয়ে দ্বীপের পশ্চিমে চলে এল ওরা। রবিনের দেখা সেই সরু পথটা চোখে পড়ল। দুই পাথরের ফাঁকে ঢুকবে বলে সাবধানে সামনে এগোল ওরা।

এখানে যদি ডুবে থাকা কোনও পাথরে লেগে বোটের তলা ফেঁসে যায়, তা হলে আর রক্ষা নেই—পাথরে আছড়ে মারবে ওদের সাগরের ঢেউ।

পথটা সরু এবং লম্বা। নানামুখী স্রোত দেখা যাচ্ছে পানিতে, পাথরের গায়ে নিয়ে ফেলতে চাইছে বোটটাকে। কিছুদূর এগোবার পর বোটের নীচে ঘ্যাঁশ করে একটা আওয়াজ হতেই জিভ শুকিয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু না, সামান্য একটু ঘষা খেয়েছে মাত্র! একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে শান্ত পানি দেখা গেল। তার ওপাশে অল্প একটু জায়গায় বালি দেখে সেদিকেই নিয়ে গেল কিশোর বোটটা।

ঘেমে নেয়ে উঠেছে মুসা ও রবিন, কিন্তু দাঁড় বেয়ে চলেছে ক্লান্তিহীন ভাবে। সামনের অংশ বালিতে ঘষা খেতেই দাঁড় রেখে লাফিয়ে নামল ওরা হাঁটু পানিতে, টেনে বেশ কিছুটা উপরে তুলে ফেলল নৌকাটা। তারপর বেঁটে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ওটাকে দড়ি দিয়ে।

পাথুরে পাড় বেয়ে উপরে উঠেই হাজার-হাজার পাখি দেখে বিজয়োল্লাসে 'হো' করে চিৎকার ছাড়তে যাচ্ছিল রবিন, কিশোরের দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল। একটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে চিৎকার করতে বারণ করছে ও।

'চলো, চট করে দ্বীপটা একপাক ঘুরে দেখি আগে,' বলল কিশোর।'

ঘুরতে গিয়ে দেখা গেল রবিনের সঙ্গে কোলাকুলি করবার ইচ্ছে নেই একটি পাখিরও। নিউ ফোর্টের পাখিগুলোর মতই, তিন

গোয়েন্দা এগোলে উড়ে গিয়ে সরে বসছে ওরা। তিন ফুট কেন, তিরিশ ফুটের মধ্যেও যেতে না পেরে যার-পর-নাই হতাশ হল পক্ষিপ্রেমিক।

সাগর থেকে যে বাড়িগুলো দেখা গিয়েছিল, সেগুলো আসলে বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। দেয়ালগুলো আছে বটে, কিন্তু ছাদ ধসে গেছে। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গিরিপথের মত দেখতে পেয়ে ওদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। কিছুদূর গিয়ে একটা ঝর্নাও দেখা গেল—সাগরে গিয়ে পড়ছে ওটার তামাটে রঙের পানি। এদিকে আরও কয়েকটা বাড়ি দেখা গেল, একই হাল।

হঠাৎ একটা গভীর গর্ত দেখে চমকে গেল মুসা।

'আরিব্বাপ! দেখে যাও এদিকে! বিরাট এক ইঁদারা!'

সবাই মিলে নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখল। নীচে অন্ধকার, তল দেখা যায় না। একটা পাথর ফেলে ছলাত আওয়াজ পাবে বলে কান পাতল ওরা, কিন্তু কিচ্ছু শোনা গেল না—মনে হল স্রেফ গিলে নিয়েছে ওটাকে নিকষ কালো অন্ধকার।

'এটা যদি খনিমুখ হয়, সিঁড়ি-মিড়ি তো দেখছি না; নামত কী করে ওরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ছিল হয়তো একসময়,' বলল কিশোর। 'ভেঙে পড়ে গেছে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল কিকো, এবার আস্তে করে নিকির কাশি দিল একটা। এতই নিখুঁত অনুকরণ যে, চমকে পিছন ফিরে চাইল রবিন।

আশেপাশে একই রকম আরও কয়েকটা খনিমুখ দেখতে পেল ওরা। ওগুলোর মধ্যে একটার মুখ আবার অন্যগুলোর চেয়ে

অনেক বেশি চওড়া। এই খনিমুখে রীতিমত ভাল একটা প্রায়-নতুন দড়ির মই দেখা গেল।

'চলো, নেমে দেখি!' বলল কিশোর।

মই বেয়ে কিছুদূর নেমে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে মন্থর হয়ে গেল ওদের নামার গতি। মুসা কিছুক্ষণ ধরে কান পেতে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছে, হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিছু?'

'কই, না তো!'

'একটু খেয়াল করে শোনো। কেমন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে না?'

'ঠিক!' কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনে বলল কিশোর। মৃদু গুঞ্জনের মত শব্দ আসছে মরা খনির ভিতর থেকে। 'কীসের আওয়াজ?'

বলতে না বলতেই অবছা ভাবে কানে এল ওদের খড়খড়-মড়মড় আওয়াজ। দেরি না করে তড়িঘড়ি উঠে এল ওরা উপরে। এবং উঠেই আবিষ্কার করল আশ্চর্য একটা ব্যাপার। পাহাড়ের গায়ের একটা গর্ত মত জায়গায় পড়ে আছে একগাদা ক্যান্ড্ ফুডের খালি টিন। ঝকঝকে নতুন।

'এগুলো কি এক-দেড়শো বছরের পুরনো হতে পারে?' নিজে প্রশ্ন করে নিজেই মাথা নাড়ল মুসা। 'অসম্ভব!'

'কারা এরা?' এবারের প্রশ্ন রবিনের। 'কী করছে খনির ভেতর? এখানে তো কোনও পিকনিক পার্টির আসার কথা না! কেউ বাস করে এখানে? তাই বা কী করে হয়?'

'চলো, ওপরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখে কেটে পড়ি,' বলল কিশোর। 'কেউ যদি এখানে থাকে, বুঝতে হবে সে বা তারা চায় না আর কেউ সে-কথা জেনে ফেলুক। যাওয়ার আগে এক-আধটা ছবি তুলবে নাকি, রবিন?'

'কোথায়, পাখি কই?' চারপাশে চাইল রবিন।

'পাখি না,' হাসল কিশোর। 'ওই টিনগুলোর। আমার মনে হয় আঙ্কেল ডিক ছবিটাকে খুব গুরুত্ব দেবেন।'

দ্বিরুক্তি না করে টিনগুলোর একটা ছবি তুলল রবিন মুসাকে ওগুলোর পাশে বসিয়ে। তারপর বলল, 'এতেই প্রমাণ হবে ছেলেটা কী রকম পেটুক!'

রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল মুসা।

ফিরতি পথে ঠিক ক্লোজ-আপ না হোক, মোটামুটি কাছেই বসে রবিনের জন্য পোজ দিল কয়েকটা স্কিউয়া, গাল, রেযারবিল আর করমোরান্ট। কিন্তু কয়েকটা ছবি তোলার পরই নিকির কথা মনে পড়ে যেতে ক্যামেরা বন্ধ করল রবিন। পা চালিয়ে চলে এল ওরা বোটের কাছে। সাবধানে দাঁড় বেয়ে শান্ত পানি থেকে বাইরের অশান্ত সমুদ্রে বেরোবার সরু মুখের কাছে এসে একটু বামে চাপিয়ে রাখল ওরা নৌকাটা। এবার আর তলায় ঘষা লাগল না, নিরাপদেই বেরিয়ে এল বোট বাইরে।

পাল তুলে দিয়ে নিউ ফোর্টের দিকে চলল তিন অভিযাত্রী। বাতাসে উড়ছে চুল, পানির ছিটে এসে লাগছে চোখে-মুখে। ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার।

দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা, জিনা এসে দাঁড়িয়ে আছে

সাগর-তীরে। বোটটা জায়গা মত তুলে দিয়ে বেঁধে ফেলল ওরা।

'মাথা ধরা?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'গন্,' জবাব দিল জিনা।

'নিকি ফিরেছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ,' বলল জিনা। হাসছে। 'ঘণ্টাখানেক আগেই ফিরেছে। ওর অপেক্ষায় বসে ছিলাম আমি চাবিটা নিয়ে। কিশোর, ঠিকই বলেছিলে, ফিরে এসেই কটা বাক্স নিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকেছে ও সেলারে—মানে, সেলারের ওপাশের ঘরটায়। আলগোছে তালা মেরে আটকে দিয়েছি আমি ওকে। দরজায় কিল দিচ্ছে এখন, আর রাজ্যের বাজে-বাজে গাল দিচ্ছে—কিচেনের দরজাটা বন্ধ করে দেয়ায় অবশ্য আওয়াজ আসছে না এপাশে।'

'ভেরি গুড!' বলল কিশোর। 'কাজের কাজ হয়েছে একটা। নৌকা নেই দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত ওর। আমরা নিয়েছি টের পেলে তো গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করত না।'

'আরও একটা কাজ হয়েছে,' বলল জিনা। 'ফুফার কাছ থেকে কিছু তথ্য বের করা গেছে ওই আইল অভ ডিজাস্টার সম্পর্কে। একটা ম্যাপও পেয়েছি খনির। টাওয়ার-রুমে চলো, দেখাচ্ছি।'

'কিন্তু, তার আগে বলো দেখি, ধরা না পড়ে ওই নিকি ব্যাটাকে বের করা যায় কী করে?' দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'বেশিক্ষণ ওখানে থাকলে আমাদের গোপন পথ না আবার বের করে ফেলে!'

'আমি দেখছি কী করা যায়,' বলল কিশোর। 'দাও, জিনা, চাবিটা আমাকে দিয়ে তোমরা ওপরে চলে যাও। যাওয়ার আগে

সবাই দেখা করে যেয়ো মলি আন্টির সঙ্গে!'

চাবিটা ওর হাতে দিয়ে সাবধান করল জিনা।

'ধরা পোড়ো না আবার! কিলিয়ে ভর্তা বানাবে!'

হাত বাড়াল মুসা। 'তার চেয়ে আমাকে দাও ওটা। আমাকে দুটো কিল দিলে আমি একটা অন্তত দিতে পারব।'

'কিলাকিলির দরকার পড়বে না,' হাসল কিশোর। 'ও যখন দরজা ধাক্কানো বন্ধ করবে, ঠিক তখনই ওর কাশির তালে তালে আস্তে করে খুলে দেব তালা। জানবেও না কখন খুলে গেছে, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়বে ধাক্কা দিতে গিয়ে।'

দ্রুতপায়ে চলে গেল ও কিচেনের দিকে।

আট

তিন মিনিট পর টাওয়ার-রুমে পৌঁছে গেল কিশোর।

সবার কৌতূহলী মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'খাঁচা খোলা! যে-কোনও মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসবে বাঘ। আর বেরিয়েই চারপাশে খুঁজবে আমাদের। তারপর নালিশ করতে গিয়ে বকা খাবে মলি আন্টির কাছে।'

সত্যিই, এমন বকা খেল আর এমন বোকা বনল নিকি যে,

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল কেবল।

'ম্যাডাম! আপনার ওই বব্-বদমাশ মেহমানগুলো আমাকে তালা মেরে আটকে দিয়েছিল সেস্-সেলারে। এর বিচার না করলে আমি...'

'আটকে দিয়েছে! ওই ছেলেমেয়েরা? কখন?' অবাক হলেন ফুফু। 'কখন আটকে দিল তোমাকে?'

'এক ঘণ্ট্-ঘণ্টা আগে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল নিকি। 'ধরতে পারলে আমি ওদের...'

'খবরদার! কিছুই করবে না তুমি ওদের, নিকি। আর বোকার মত কথা বলবে না!' চোখ গরম করে ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন মলিফুফু। 'ছেলেরা সকাল থেকে বাইরে, এইমাত্র ঢুকল বাড়িতে। জিনা সারাদিন মাথা-ব্যথায় শয্যাশায়ী, একটু আগে উঠল বিছানা ছেড়ে। একঘণ্টা আগে কে আটকাল তোমাকে, সেলারে? কীকরে? সেলারের দরজায় কি তালা আছে যে আটকাবে? বে-আক্কেল কোথাকার! বলো, আছে তালা?'

এতক্ষণে হুঁশ হল নিকির, ও যে-দরজার কথা বলছে সেটার কথা জানা নেই ম্যাডামের। এখন জোর দিয়ে কিছু বলতে গেলে সেলারে নেমে ম্যাডাম আবিষ্কার করে ফেলবে ওর গোপন কামরা।

'ন্-ন্-না,' বলল নিকি আমতা-আমতা করে।

'তা হলে? কী মিথ্যে নালিশ নিয়ে এসেছ তুমি আমার কাছে? ওরা আসার পর থেকেই দেখছি লেগে আছ তুমি ওদের পেছনে। বাড়াবাড়ি কোরো না নিকি, যাও, নিজের কাজ করোগে যাও!'

*

ম্যাপ দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এইতো, এই গর্তেই দড়ির মই আছে, নেমেছিলাম আমরা কিছুদূর।'

'আবার একবার টর্চ নিয়ে যেতে হবে,' বলল কিশোর।

'ফুফাকে খনি-সুড়ঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় বললেন, ভাল একটা বই আছে তাঁর কাছে এ-বিষয়ে। কপারটাউনের সবকটা খনির ইতিহাস আছে ওতে। খুঁজে পেলে দেবেন পড়তে।'

'ভেরি গুড! আরে!' ম্যাপটা উল্টে টেপ দিয়ে সাঁটা আরেকটা ছোট ম্যাপ পেয়ে গেছে কিশোর। ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, 'এটা কী দেখো তো! এত দাগ কীসের?'

ছোট ছোট হরফের লেখা চট্ করে পড়ে নিয়ে রবিন বলল, 'দারুণ জিনিস! খনির ভেতরের ম্যাপ। এটা সঙ্গে থাকলে ওখানে নেমে পথ হারাবার উপায় নেই। দেখো, দেখো, কিশোর!' ম্যাপের একটা অংশে আঙুল রাখল ও, 'খনির এই অংশ পুরোটাই সমুদ্রের নীচে!'

'খাইছে!' ছানাবড়া হয়ে গেল মুসার চোখ। 'হুড়মুড় করে ছাদ ভেঙে পানি নেমে এলেই গেছি!'

ম্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, দ্বীপের নীচটা পরস্পরের সঙ্গে জোড়া অসংখ্য টানেলের সমষ্টি। প্রচুর তামা তোলা হয়েছে ওখান থেকে। অবশিষ্ট রাখা হয়নি কিছুই।

তা হলে? খালি ক্যান পড়ে আছে কেন তা হলে? কী করছে এখন ওখানে কিছু লোক? নীচ থেকে গুমগুম কীসের আওয়াজ? তিন গোয়েন্দা আলোচনা করে ঠিক করল, স্যান্ডেল ডিককে

জানাতে হবে সব কথা।

বিকেলে নিকি যখন ওর সবজি খেত নিয়ে ব্যস্ত, ওরা চারজন বেরিয়ে পড়ল ডিক কার্টারের কুটিরে যাবে বলে। ওরা টেরও পেল না, বেশ অনেকটা দূর থেকে গোপনে অনুসরণ করছে ওদের নিকি মন্টিয়ানো।

ডিক কার্টারকে পাওয়া গেল না কুটিরে। ওরা দেখল বোটটা জায়গা মতই আছে, কিন্তু গাড়ি নেই। তার মানে, কোনও কাজে কোথাও গেছেন আঙ্কেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন এলেন না তিনি, ফিরে গেল ওরা নিউ ফোর্টে।

সেই রাতে নৌকা নিয়ে সাগরে গেল নিকি। ফিরল অনেক রাতে, বড়সড় তিনটে মাছ নিয়ে।

ঠিক পরদিনই আবার সুযোগ পেল ওরা। সারাদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে নিকি, গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে শহরে। এবার জিনাও যাবে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। নিকি বেরিয়ে যেতেই মলিফুফুর কাছ থেকে লাঞ্চ প্যাকেট চাইল ওরা। শরীরটা ভাল নেই তাঁর, খুশিই হলেন ওদের পিকনিকে যাওয়ার কথা শুনে—সারাটা দিন চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারবেন।

দক্ষ নাবিকের মত নিকির নৌকায় পাল তুলে দিয়ে পৌঁছে গেল ওরা আইল অভ ডিজাস্টারের প্রবেশমুখের কাছে। তারপর পাল নামিয়ে দাঁড় বেয়ে ঢুকে পড়ল সরু পথ বেয়ে। এবারও ডুবো-পাথরের সঙ্গে সামান্য ঘষা খেল বোটের তলা—আঁতকে উঠল জিনা দুর্ঘটনার ভয়ে।

বোট ভিড়িয়ে টেনে ওটাকে কিছুটা ডাঙায় তুলে রাখল ওরা, তারপর পা চালিয়ে অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল বড় শ্যাফটের কাছে।

'আরে!' মুসার চোখে পড়ল ব্যাপারটা প্রথম, 'আমার সাবাড় করা টিনগুলো সব গেল কোথায়?'

সবাই চেয়ে দেখল, গতকাল যেখানে পঁচিশ-ত্রিশটা খালি টিন ছিল, আজ একটাও নেই সেখানে।

'অর্থাৎ?' স্কুল টিচারের ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর। উত্তর দিল নিজেই, 'প্রমাণ হয়ে গেল, এই দ্বীপে মানুষের আসা-যাওয়া আছে। চলো, দেখি গিয়ে নীচে কী করছে মানুষগুলো। কিন্তু সাবধান, ওদের চোখে পড়লে চলবে না। ওদের সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানি না আমরা। শুধু আড়াল থেকে দেখেই ফিরে আসব।'

'না কি এখান থেকেই ফিরে যাব, কিশোর?' বলল জিনা। 'ওরা যদি ডাকাত-টাকাত হয়?'

'ডাকাত হলে খনিতে নেমে কাজ করত না। এরা তো রীতিমত কাজ করছে। খুব সম্ভব কেউ ডিপোজিটের একটা নতুন শিরার সন্ধান পেয়েছে, গোপনে তুলছে তামা। তোমার কি খুব বেশি ভয় করছে?'

'করছে,' বলল জিনা। 'তবে তোমরা নামলে আমিও নামব, একা ওপরে থাকতে পারব না।'

নামতে শুরু করল ওরা। শ্যাফটটা যে কতটা গভীর কোন আন্দাজই ছিল না ওদের। নামছে তো নামছেই, বিশ মিনিট নামার পরেও টর্চের আলো ফেলে নীচে কিচ্ছু দেখতে পেল না।

এদিকে ব্যথায় টনটন করছে হাত। কিশোরের নির্দেশে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নিল সবাই। গুঞ্জনটা আছে, কিন্তু আজ আর খড়-মড় আওয়াজটা নেই। জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু হল নামা। মনে হল, কোনদিন নামার শেষ হবে না। মাটিতে যখন পা ঠেকল, ওদের মনে হল, পৃথিবীর মাঝখানটায় পৌঁছে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু ভাপসা মত গরম। টর্চের আলোয় দেখা গেল চওড়া একটা প্যাসেজে রয়েছে ওরা। দুপাশের দেওয়াল আর ছাদ পাথরের। একটু এগোতেই দেখল এই প্যাসেজ থেকে দুই দিকে শাখা টানেল গেছে একের পর এক।

'এটাকে মেইন রোড ধরে নিয়ে এরই ওপর থাকব আমরা,' বলল কিশোর চাপা গলায়। 'এদিক-ওদিক আর কোনও দিকে নয়, ঠিক আছে?'

একটা সাইড লেনে আলো ফেলে থমকে দাঁড়াল মুসা। 'ওই দেখো, ছাদ ধসে বন্ধ হয়ে গেছে টানেলটা!'

'ঠিক, ঠিক!' বলল কিকো চাপা গলায়। আঁধার দেখে ভয়ে বুজে এসেছে ওর কণ্ঠস্বর।

'ভেঙে মাথায় না পড়ে!' বলল জিনা। 'দেখছ না, কোনও কোনও জায়গায় কাঠ দিয়ে ঠেকা দেয়া রয়েছে!'

'কয়েকশো বছর যখন টিকে থাকতে পেরেছে, আরও একটা দিন পারবে,' মন্তব্য করল রবিন।

'কিন্তু কেমন একটা দম আটকানো ভাব রয়েছে না এখানটায়?' বলল জিনা। 'যদিও শ্বাস নিতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সমুদ্রের নীচে আছি বলে চাপ পড়ছে মনের

ওপর।'

'সমুদ্রের নীচে আসিনি আমরা এখনও,' বলল কিশোর। 'দ্বীপেই আছি।'

'অন্ধের মত এই অন্ধকারে আর কতক্ষণ?' প্রশ্ন মুসার।

'এই তো, এসে পড়েছি প্রায়,' আশ্বস্ত করল ওকে কিশোর। 'গোঁ-গোঁ আওয়াজটা বাড়ছে খেয়াল করনি? মনে হচ্ছে জেনারেটর চলছে কোথাও,' বলেই থেমে দাঁড়াল ও। 'দেখো তো রবিন, চিনতে পার কি না জিনিসটা?'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, হলুদ একটা কপিইং পেনসিল পড়ে রয়েছে মাটিতে। 'আরে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। তারপর সামলে নিয়ে নিচুগলায় বলল, 'আঙ্কেল ডিকের পেনসিল ওটা!'

রবিন ওটা তুলে নিল। 'তা হলে কি এই গোপন খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারে আঙ্কেল ডিকও জড়িত?' মাথা নাড়ল। 'যদি তাই হয়, তা হলে বুঝতে হবে এতে বেআইনি কিছু নেই।'

'আঙ্কেল ডিককে তুমি সেই ছোটবেলা থেকেই চেনো বলে মনে হচ্ছে?' ঠাট্টা করল কিশোর।

'হ্যাঁ, উনি যখন আমার সমান ছিলেন, তখন থেকেই!' হেসে বলল রবিন।

কিন্তু প্যাসেজটা হঠাৎ বামে ঘুরতেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল সবার। ম্যাপে দেখেছে ওরা, মেইন প্যাসেজটা বামে ঘুরেই চলে গেছে সমুদ্রের নীচ দিয়ে। ভয়ে গা ছমছম করছে ওদের, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রোমাঞ্চও জাগছে—আশ্চর্য একটা অনুভূতি! একটু পরেই বহু দূরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মত একটা আওয়াজ

শুনতে পেল ওরা। এই শব্দ শুনেই কি নীচে জেনারেটর চলছে বলে ধরে নিয়েছিল ওরা? উঁহুঁ! ওটা এই আওয়াজ নয়। বেশ অনেকদূর এগিয়ে হঠাৎ ডানদিকের একটা সাইড টানেলে আলোর আভাস দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু মেইন প্যাসেজ ছেড়ে অন্য কোনও দিকে গেলে যদি পথ হারিয়ে ফেলে-এই ভেবে সাহস পাচ্ছে না এগোতে।

কৌতূহলেরই জয় হল। পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা চৌরাস্তায় পৌঁছতেই উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ। মস্ত একটা গুহাকে আলোকিত করে রেখেছে পাঁচশো পাওয়ারের দুটো বৈদ্যুতিক বাল্‌ব। ওরা অবাক হয়ে দেখছে, এমনি সময়ে খুব কাছেই শুরু হল সেই খড়খড়ে আওয়াজটা। অনেক জোরে।

ঘুরেই দৌড় দেওয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল ওরা।

'এখানেই তা হলে চলছে খোঁড়াখুঁড়ি,' বিড়-বিড় করে বলল কিশোর।

নয়

অল্পক্ষণেই তীব্র আলোটা সয়ে এল চোখে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে ভিতরে তাকাল ওরা। যতদূর দেখা যায় অনেকগুলো বাক্স

সাজানো কেবল, লোকজন নেই গুহায়। আওয়াজ এই গুহা থেকেই আসছে, কিন্তু প্যাসেজটা বাঁকা হয়ে আরেকদিকে চলে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

'চলো, ফিরে যাই,' বলল জিনা।

'না,' বলল কিশোর। টর্চ জ্বেলে একটা অন্ধকার গুহার দিকে ইঙ্গিত করল, 'তোমরা ওর ভেতর একটু সামনে গিয়ে দাঁড়াও, আমি ওই বাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে আসি কা হচ্ছে আসলে।'

কিশোর মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, এমনি সময়ে প্রায় একই সঙ্গে ঘটতে শুরু করল যেন কয়েকটা ঘটনা। জোর আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে একটা পাথর খসে পড়ল অন্ধকার গুহাটায়। দেয়াল হাতড়াতে গিয়ে ফেলে দিয়েছে ওটা রবিন। পরমুহূর্তে ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল কিকো।

চাপা গলায় ডাকল মুসা, 'এই যে, কিকো! এখানে!' কিন্তু ওর কাঁধে ফিরে আসছে না দেখে পাশের আরেকটা গুহায় ঢুকল ও কিকোর খোঁজে।

মানুষের গলার শব্দ পেল কিশোর সামনে থেকে। কথা বলতে বলতে এইদিকেই আসছে। আওয়াজ কাদের দেখতে আসছে খুব সম্ভব। দৌড়ে চলে এল ও অন্ধকার গুহায়। কিন্তু এই গুহাটা এখন আর অন্ধকার নেই—দুজন লোক আসছে সামনে থেকে, ওদের একজনের হাতে লণ্ঠন। বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনা ও রবিন। মুসা নেই ওদের সঙ্গে।

'জলদি! দৌড় দাও!' বলল কিশোর। কিন্তু দৌড়ে যাবে কোথায়, পিছন ফিরে দেখল আলোকিত গুহায় এদিকে মুখ করে

দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন লোক, তাদের মধ্যে একজনের এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা। অবাক দৃষ্টিতে দেখছে সবাই ওদেরকে।

'আরে, স্মাগ্‌স্! চোখে ঠিক দেখছি তো? এরা কোত্থেকে এল? আমি জেগে না ঘুমিয়ে?'

'জেগেই আছ, বিল,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল স্মাগস। তিন ছেলে-মেয়ের দিকে কড়া দৃষ্টিতে চাইল সে। 'তোমরা কী করছ এখানে? কার সাথে এসেছ? সঙ্গে আর কে আছে?'

'আর কেউ নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা নিজেরাই এসেছি দ্বীপে পিকনিক করতে।'

'পিকনিক?' বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল চোখে পট্টি বাঁধা স্মাগস। 'ওসব চাপায় কাজ হবে না, ছোকরা! সত্যি করে বলো, কার সঙ্গে এসেছ, এবং কেন?'

'সত্যি কথাই বলছি আমরা!' রেগে গিয়ে বলল জিনা। 'আমাদের হ্যাভারস্যাকে খাবার আছে। নৌকা নিয়ে এসেছি আমরা নিউ ফোর্ট থেকে। দ্বীপে অনেক পাখি দেখে নেমেছি।'

'এই খনিতে নেমেছ কেন? নিশ্চয়ই পাখি দেখতে নয়?' কাছে এগিয়ে এল স্মাগস। ওর নিষ্ঠুর চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ছেলেমেয়েরা। 'কই, বলো, এখানে কেন তোমরা?'

'নেমেছি পুরনো খনি দেখতে,' বলল রবিন। 'এখানে নামা নিষেধ এরকম কোনও সাইনবোর্ড তো দেখিনি কোথাও!'

'এই ছোকরা দেখি ত্যাড়া-ত্যাড়া কথা বলছে!' বলল বিল। 'মনে হয় কোথাও দিন কয়েক আটকে রাখলে সোজা হয়ে যাবে কথাগুলো। কী করবে, স্মাগস? এগুলোকে এখনই জবাই করে

গুম করে ফেলবে, না কি বসের জন্যে অপেক্ষা করবে?'

জবাইয়ের কথা শুনে পিলে চমকে গেল জিনার। বলল, 'আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না।'

'কী বলবে না?' জানতে চাইল বিল।

'বলব না যে, আপনারা নতুন ডিপোজিটের খোঁজ পেয়ে আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছেন পুরনো খনিতে।'

'কে বলল আমরা···' বলতে গিয়েও চট করে থেমে গেল স্মাগস। তারপর ফিরল বিলের দিকে। 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কী করা উচিত। এদের বরং কোথাও আটকে রাখো। বস্ এলে ভাল মত ইন্টারোগেট করা যাবে।'

কিশোরের পিঠে ধাক্কা দিল বিল। 'এগোও, ব্রাদার! সামনে!'

কিছুদূর গিয়েই ডানদিকে মোড় নিতে হল, তারপর সরু কয়েকটা প্যাসেজ ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে একটা দরজার হ্যাজবোল্ট খুলল বিল। 'ঢোকো ভেতরে,' বলল সে। 'সময় মত খাবার পাবে, তোমাদের না খাইয়ে মারব না আমরা। তবে জেনে রাখো, সত্যি কথা না বললে আমাদের হাত থেকে নিস্তার নেই।' এই বলে দরজা বন্ধ করে লক্ করে দিল লোকটা।

ছোট্ট একটা ঘর। কয়েকটা বেঞ্চ আর একটা টেবিল রয়েছে ঘরে। বিল আলো নিয়ে বেরিয়ে যেতেই নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা।

'মুসা গেল কোথায়!' বলল কিশোর। 'কপাল ভাল যে ও মুক্ত আছে, আমাদের উদ্ধার পাওয়ার একটা সম্ভাবনা অন্তত খোলা থাকছে।'

কিন্তু মুসা কী উদ্ধার করবে, ও নিজেই তো পথ হারিয়ে ঘুরছে এখন খনির ভিতর। কিকোর খোঁজে ডাইনের সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল ও, আরও বার দুয়েক বাঁক নেওয়ার পর পেয়েছে ওকে, কিন্তু ততক্ষণে হারিয়ে ফেলেছে পথ। জানে না, বন্দি হয়েছে ওর বন্ধুরা। এ-গলি ও-গলি ধরে ও হাঁটছে তো হাঁটছেই।

ম্যাপটা কিশোরের কাছে, পথ হারিয়ে মেইন প্যাসেজে ফিরে আসবার সহজ কোনও উপায় জানা নেই মুসার। যে গুহা সামনে পড়ছে তারই ভিতর ঢুকছে ও। কিছুদূর গিয়ে বন্ধ দেখলে আগের পথে ফিরে এসে আবার খুঁজছে পথ।

'বুঝলি, কিকো,' প্রিয় পাখির কানে কানে বলল ও, 'হারিয়ে গেছি আমরা। আর যদি ফিরে যেতে না পারি, কেমন হবে ব্যাপারটা? আচ্ছা, জোরে চেঁচিয়ে দেখব নাকি?'

চ্যাচানোর কথা শুনেই 'চ্যা' করে কানের পর্দা ফাটানো এক চিৎকার ছাড়ল কিকো। মুসাও বারবার চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, রবিন আর জিনাকে। প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর এল না।

দুপুরে হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে টর্চের আলোয় লাঞ্চ খেয়ে নিল ওরা তিনজন। তারপর আর করবার কিছুই থাকল না।

বসে থেকে-থেকে বিরক্ত হয়ে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ল কিশোর। জিনা চৌবলে মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়ল। রবিন খানিক বসে থাকে চুপচাপ, খানিক পায়চারি করে, আবার এসে বসে।

কিশোরের কাছ থেকে টর্চটা চেয়ে নিয়ে ঘড়ি দেখছে বারবার। বিকেল হয়ে আসছে দেখে অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমেই।

'এখান থেকে পালাতে হবে,' বলল রবিন। 'কিন্তু কীভাবে?'

'মুসা এসে খুলে দিলেই পালিয়ে যাব,' বলল কিশোর।

'ও গায়েব হল কীকরে? কখন? কেনই বা?'

'কেন, তা বলতে পারব না; তবে ডানদিকে একটা অন্ধকার গুহা দেখেছি, খুব সম্ভব ওর ভেতর ঢুকেছে মুসা। লোকজন এসে পৌঁছবার আগেই।'

'তা হলে দরজা খুলে বের করছে না কেন আমাদের?'

'কাছে-পিঠে থাকলে এতক্ষণে তাই করত,' বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে, পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায়। সঙ্গে ম্যাপ নেই বলে ফিরতে পারছে না মেইন প্যাসেজে।'

'ভাগ্য ভাল যে একটা টর্চ আছে ওর কাছে।'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া কথা বলার সঙ্গীও আছে। সাহায্যের আশায় না থেকে মনে হচ্ছে, নিজেদের চেষ্টায় উদ্ধার পেতে হবে আমাদের।'

'কীভাবে?' প্রশ্ন করল জিনা। জেগে গেছে।

'ধরো, কেউ দরজা খুললেই আমরা তিনজন অভিনয় শুরু করতে পারি, যেন বাতাসের অভাবে দম আটকে মারা যাচ্ছি।'

'কী লাভ তাতে?'

'ঘাবড়ে গিয়ে লোকটা হয়তো আমাদের ঘর থেকে বের করে প্যাসেজে নেবে। সুযোগ বুঝে আমরা লাথি মেরে ওর হাতের বাতিটা নিভিয়ে দিয়েই দৌড় দিতে পারি।'

টেবিল থেকে মাথা তুলল জিনা। 'দৌড়ে কোন্‌দিকে যাব? আমি তো ইতিমধ্যেই গুলিয়ে ফেলেছি সব।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' বলল কিশোর। 'বরং সুবিধে। প্রথমেই আমরা মেইন প্যাসেজের দিকে গেলে ধরা পড়ে যাব। প্রথমে আমাদের সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়ে ওদের চোখ ফাঁকি দিতে হবে। তারপর ম্যাপ দেখে ফিরে আসব মেইন শ্যাফটের নীচে। ওদের হাত ফসকে বেরোতে পারলে আমাদের কেবল একটা ব্যাপারেই সতর্ক থাকতে হবে—শক্ত করে ধরে রাখতে হবে পরস্পরের হাত।'

রবিন ও জিনার পছন্দ হল কিশোরের প্ল্যান। কার কী ভূমিকা ঠিক করে নিল সবাই। তারপর জিনা এমন এক বুককাটা আর্তনাদ ছাড়ল যে ব্যস্ত হয়ে উঠল রবিন: 'কী হল, জিনা? কিশোর, টর্চটা!'

হাসল কিশোর। 'চমৎকার হয়েছে, জিনা। এই রকম একটা পিলে চমকানো চিৎকার ছাড়তে পারলেই বাজি মাত!'

'তাই বলো,' হাঁফ ছাড়ল রবিন। 'প্র্যাকটিস হচ্ছে! আমি তো ভেবেছি...' হঠাৎ গলা নামাল ও, 'কে যেন আসছে এদিকে!' বলেই দুই হাতে নিজের গলা চেপে ধরে গুঙিয়ে উঠল চাপা কণ্ঠে।

ক্লিক করে তালা খুলে ঘরে ঢুকল কানা স্মাগস। এক হাতে একটা হারিকেন, অপর হাতে একটা থালায় অনেকগুলো বিস্কিট। টেবিলের উপর থালাটা নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে চাইল সে তিন বন্দির দিকে। জিনা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে, গুঙিয়ে উঠল

বেঞ্চিতে বসা রবিন, আর কিশোরকে দেখে মনে হচ্ছে ওর চোখ দুটো এখুনি ছিটকে মেঝেতে পড়ে ড্রপ খাবে। আর্তনাদ ছাড়ল জিনা গলা চেপে ধরে।

'কী হল! ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল স্মাগস।

'বাতাস! বাতাস!' কোনও মতে বলল রবিন। 'মরে যাচ্ছি বাতাসের অভাবে!'

একটানে জিনাকে দাঁড় করিয়ে দিল স্মাগস, ঠেলা দিল বাইরের দিকে। তার মনে হল ছোট ঘরের বাতাসে অক্সিজেন কমে যেতেই পারে।

'বেরোও, বেরোও!' ধাক্কা দিল কিশোর ও রবিনের পিঠে।

টলছে কিশোর। এলোমেলো পা ফেলে দুই কদম এগোল, তারপর ঝটাং করে লাথি মেরে দিল স্মাগসের হাতে ধরা হারিকেনের কাঁচে। দপ্ করে নিভে গেল বাতি, ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ল ভাঙা কাঁচ।

একলাফে বাইরে বেরিয়ে এসে দুজনের দুই হাত চেপে ধরল কিশোর, তারপর ঝেড়ে দিল দৌড়। এদিকে ঘরের মধ্যে অন্ধকার হাতড়াচ্ছে তখন কানা স্মাগস্, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে লোক ডাকছে: 'জেক, বিল, জলদি এসো। আলো, আলো! আরে, জলদি করো! পালাল, পালিয়ে গেল ওরা!'

প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে ওরা অন্ধকারে, মাঝে মাঝে কেবল সামনেটা দেখে নেওয়ার জন্য এক সেকেন্ড করে জ্বালাচ্ছে টর্চ। সাত-আটটা বাঁক নেওয়া হয়ে গেলে চলার গতি কিছুটা কমাল কিশোর। তারপর হঠাৎই মেইন প্যাসেজে এসে পড়ল। ছুটল ওরা

খনিমুখের দিকে।

'মুসা?' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন।

ওর হাত ধরে টান দিল কিশোর। 'চলে এসো! ও কোথায় জানি না আমরা। এমনও হতে পারে, এতক্ষণে ওপরে উঠে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আর যদি এখনও গুহার ভেতরই রয়ে যায়, আমরা সাহায্যের জন্যে লোক নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবে ও ভেতরেই।'

'ওকে ফেলেই চলে যাব আমরা?' জিনাও আপত্তি তুলল।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে ধমক দিল কিশোর।

'অযথা দেরি করিয়ে দিচ্ছ তোমরা! আমরা যদি আবার ধরা পড়ি, সাহায্যের জন্যে কেউ থাকবে না আর। ধেয়ে আসছে স্মাগস লোকজন নিয়ে। ওরা জানে আমরা খনিমুখে পৌঁছবার চেষ্টা করছি।'

আর বোঝানোর দরকার পড়ল না। হই-হল্লার আওয়াজ কানে এল। এগিয়ে আসছে এইদিকেই। ছোটার গতি বেড়ে গেল রবিন ও জিনার। কিন্তু বড়দের সঙ্গে দৌড়ে ছোটরা পারবে কেন? ক্রমে এগিয়ে আসছে পিছনে ধাওয়াকারী দলটা।

মইয়ের কাছে যখন পৌঁছল, তখন আর বেশি দূরে নেই পিছনের লোকগুলো।

'নাও, উঠতে শুরু করো। জিনা প্রথমে, তারপর রবিন। ভয় পেয়ো না-দশ ফুট উঠতে পারলেই আর চিন্তা নেই; প্রয়োজনে মইয়ের দড়ি কেটে দেব আমরা।'

কিন্তু দড়ি কাটবার প্রয়োজন পড়ল না। আশ্চর্য একটা ঘটনা

সরিয়ে দিল ধাওয়াকারীদের অন্যদিকে। মুসার কাঁধে বসে লোকজনের চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে কিকো। শুনে উত্তেজিত হয়ে নিজেও চিৎকার শুরু করল। প্রথমে বিকট এক হাঁক ছাড়ল, মোটর সাইকেলের আওয়াজ করল, তারপর শুরু করল ওর মুখস্থ ধমক: 'পা মুছে ঘরে ঢোকো, গাধা কোথাকার! আবার দরজা পটকাচ্ছ কেন? দাঁড়াও আসছি! দেখাচ্ছি মজা!'

কিকোর গলার আওয়াজ শুনে থেমে দাঁড়িয়ে হাসল স্মাগস।

'ওই শোনো! সুড়ঙ্গের ভেতর পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে এখন বদমাশগুলো! চেঁচাচ্ছে সাহায্যের জন্যে। কোনদিন বেরোবার পথ খুঁজে পাবে না। ঘুরতে থাকুক, ঘুরে ঘুরে না খেয়ে মরুক ওরা!'

'তা হয় না!' বলল বিল। 'ওদের খোঁজে সার্চপার্টি এলে আমরা বেকায়দায় পড়ে যাব। যেমন করে হোক খুঁজে বের করতে হবে ওদের।'

'যতক্ষণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ ওপরে ওঠার মইটা পাহারা দিতে হবে একজনের,' বলল জেক, 'আমি মেইন শ্যাফটের কাছে একটা গুহায় চুপচাপ বসে থাকি গিয়ে।' আঙুল তুলে দেখাল, 'ওইদিক থেকে আওয়াজ এসেছে, তোমরা ওদিকটা ভাল করে খুঁজে দেখো।'

খনিমুখের দিকে এগোল জেক। অন্যেরা চলল আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে সেই দিকে। কিছুদূর গিয়ে স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা, 'আবার কথা বলে! কোনও কথা শুনতে চাই না আমি!'

অবাক হয়ে গেল লোকগুলো। ছেলে-মেয়েদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে মনে করে মুচকি হাসল। তারপর শব্দের

উৎস লক্ষ্য করে এগোল দ্রুতপায়ে।

ঘুরতে ঘুরতে আরেক গুহায় চলে গেল মুসা। চুপ হয়ে গেছে কিকো। এই গুহার সামনে দিয়ে চলে গেল লোকগুলো আরেক দিকে। কিছুদূর যায়, আর থেমে কান পাতে।

'কই, আর তো কিছু শোনা যায় না!' বলল একজন। 'ওরা মই বেয়ে উঠে গেল না তো?'

'জেক আছে ওখানে, তবু চলো, সবাই একবার দেখে আসি খনিমুখটা,' বলল স্মাগস।

ঘাপটি মেরে বসে ছিল জেক, ওদের দেখে বেরোল একটা সুড়ঙ্গ থেকে। বলল, 'এদিকে আসেনি। ফিরে এলে যে?'

'মইটা, হাত দিয়ে দেখেছ, কাঁপে কি না?' জিজ্ঞেস করল বিল। বলেই মইয়ে হাত দিল সে। 'আরে! কী পাহারা দিচ্ছ তুমি ওখানে বসে? ওরা তো ওপরে প্রায় পৌঁছে গেছে!' বলতে না বলতে কয়েকটা ছোট পাথরের টুকরো নেমে এল উপর থেকে

পাগলের মত মই বেয়ে উঠতে শুরু করল বিল, তার পিছনে স্মাগস। কিন্তু ওদের অনুসরণ টের পেয়ে গেল ওপরের তিনজন। ঝটপট বাকিটুকু উঠেই কিছু ধুলো আর মাটি ফেলল খনিমুখ দিয়ে নীচে। হাউমাউ করে, চেঁচিয়ে ওঠার শব্দ ভেসে এল। আরও কিছু মাটির ঢেলা ফেলেই দৌড় দিল ওরা ছোট্ট সৈকতের উদ্দেশে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিকির বোটটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পাওয়া গেল। দেরি না করে ওটাকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। হাল ধরল কিশোর, দাঁড় বাইছে জিনা আর রবিন। সরু মুখটা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে

বাইরের সাগরে পড়েই ওরা তুলে দিল পাল।

'মুসাকে ফেলে রেখে যেতে খুব খারাপ লাগছে,' মন খারাপ করে বলল রবিন।

'আমারও,' সমস্বরে বলল জিনা ও কিশোর।

জেক, বিল আর স্ম্যাগস যখন সৈকতে এসে দাঁড়াল, তখন কেউ নেই ওখানে। জোয়ার আসছে বলে ওখানে যে বোট ছিল তার কোনও চিহ্নও নেই।

'এলই বা কীসে করে!' আপন মনে বলল বিল। 'আর গেলই বা কীসে! দ্বীপেই কোথাও লুকিয়ে নেই তো?'

'চলো, ভাল মত খুঁজে দেখি,' বলল কানা স্ম্যাগস। 'পেলে ভাল, নইলে আজ রাতে সিগন্যাল পাঠিয়ে ডাকতে হবে কাউকে। তিনটে ছেলেমেয়ে যে খনিতে নেমেছিল, একথা জানিয়ে সাবধান করে দিতে হবে সবাইকে।'

দ্বীপের উপর কাউকে খুঁজে না পেয়ে ঝুলন্ত মই বেয়ে নেমে গেল ওরা নীচে, জানতেও পারল না, ছেলেমেয়েদের একজন রয়ে গেছে খনিতেই। বেচারা মুসা মেইন প্যাসেজের খোঁজে একের পর এক গুহাপথে ঢুকছে, ওর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। সব গুহা একই রকম লাগছে ওর কাছে। অবসাদে ভেঙে আসছে পা। ভয় লাগছে, যদি কোনদিন আর পথ খুঁজে না পায়!

দশ

নিউ ফোর্টে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। নৌকাটা জায়গামত বেঁধে রেখে ঘরে ফিরেই জোর ধাতানি খেল ওরা মলিফুফুর কাছে। ওদের দেরি দেখে রীতিমত উৎকণ্ঠায় পড়ে গিয়েছিলেন বেচারি।

'ভাগ্যিস খেয়াল করেনি যে মুসা নেই!' বলল জিনা ফিসফিস করে। 'তা হলে বাড়ি মাথায় করত চেঁচিয়ে।'

নিকি ফেরেনি এখনও, এটাও ভাগ্যের কথা। ওদের আগে ফিরে এলে নৌকা নেই দেখে কী কাণ্ড করত কে জানে! খাওয়ার পর-পরই মলিফুফুর নজর এড়িয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর ও রবিন আঙ্কেল ডিকের ডেরার উদ্দেশে। মাঝপথে গাড়ির আলো দেখে লুকাল একটা বোল্ডারের আড়ালে। ঝরঝর আওয়াজ তুলে কাঁপতে-কাঁপতে চলে গেল গাড়িটা নিউ ফোর্টের দিকে। ফিরে এল নিকি।

'এত রাতে আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবেন আঙ্কেল ডিক,' বলল কিশোর।

'উনি কি বিশ্বাস করবেন আমাদের কথা? রেগে যাবেন না নিকির নৌকা নিয়ে আইল অভ ডিজাস্টারে গিয়েছি বলে?' চিন্তিত

রবিন। একটু থেমে বলল, 'হয়তো হাঁকিয়েই দেবেন আমাদের।'

কীভাবে কী বলবে, মনে মনে গুছিয়ে নিল কিশোর হাঁটতে হাঁটতে। তারপর বলল, 'অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে শহরে গিয়ে পুলিশকে জানাব আমরা। আগে দেখি আঙ্কেল কী বলেন।'

কিন্তু পৌঁছে দেখল ওরা আঙ্কেল ডিক নেই কুটিরে।

হায়-হায়! কী করবে ওরা এখন?

হেঁটেই রওনা দেবে কপারটাউনের উদ্দেশে? গিয়েই বা কী লাভ, ওখানকার পুলিশ তো ওদের চেনে না: হয়তো ওদের কথার কোনও গুরুত্বই দেবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। হেঁটে হলেও যেতে হবে ওদের কপারটাউনে।

সারাদিনের উত্তেজনা ও পরিশ্রমে গা কাঁপছে কিশোরের। রবিনের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও খারাপ। অন্তত দশটা মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তারপর রওনা দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। এর মধ্যে এসেও পড়তে পারেন আঙ্কেল।

দুজন দুটো চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল।

'প্রয়োজনে আমাদের দুজনকেই যেতে হবে আবার,' বলল কিশোর। 'নীচে নেমে যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনব মুসাকে।'

অন্ধকারে বসে আছে চুপচাপ, হঠাৎ কেমন একটা অনুভূতি হতেই পাশ ফিরল কিশোর। পার্টিশনের ওপাশ থেকে একটা আলোর ছটা আসছে বলে মনে হল ওর। উঠে ঘরের পিছনের অংশে চলে এল ও।

লাল একটা আলো জ্বলছে নিভছে। কিছু একটা সিগন্যাল দিচ্ছে আঙ্কেল ডিকের ওয়ায়েরলেস সেট! মোর্স কোডে আসছে

সঙ্কেত। চেয়ারে ফিরে যাওয়ার আগে টর্চটা জ্বেলে ভাল করে দেখল ও সেটটা। চোখে পড়ল টেলিফোনের রিসিভার আকৃতির একটা জিনিস।

ওটা তুলতেই টের পেল কথা বলছে কেউ অপর প্রান্তে। কানে ঠেকিয়ে শুনল কেউ বলছে, 'কে-থ্রি কলিং। কে-থ্রি। কে-থ্রি কলিং ওয়াই-ফোর।'

'হ্যালো!' বলল কিশোর, 'কে বলছেন আপনি?'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল গলাটা। তারপর বিস্মিত কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে ওখানে?'

'আমি কিশোর পাশা। আঙ্কেল ডিকের কাছে এসেছিলাম জরুরি একটা কাজে। কিন্তু এসে দেখি উনি ঘরে নেই।'

'কার কথা বললে?'

'ডিক কার্টার,' বলল কিশোর। 'আমরা আঙ্কেল ডিক বলি। উনি ঘরে নেই। আপনি কে বলছেন? আপনি চাইলে আমি আপনার মেসেজ লিখে এখানে রেখে যেতে পারি। ফিরে এলেই পেয়ে যাবেন উনি আপনার মেসেজ।'

'কতক্ষণ আগে বাইরে গেছে ও বলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল কে-থ্রি।

'তা বলতে পারব না...দাঁড়ান, দাঁড়ান! কে যেন আসছে এইদিকে! হ্যাঁ, আঙ্কেল ডিকের শিস শুনতে পাচ্ছি। আপনি রিসিভারটা একটু ধরে রাখুন, প্লিজ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে এপাশে চলে এল কিশোর।

টর্চ জ্বেলেই রবিন আর কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন

ডিক কার্টার। বিস্মিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন ওদেরকে।

'আপনার ফোন,' বলল কিশোর। 'কে-থ্রি বলে একজন ডাকছে আপনাকে ওয়ায়েরলেস সেটে।'

'তুমি কিছু বলেছ তাকে?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে লম্বা পা ফেলে পার্টিশনের ওপাশে গিয়ে রিসিভার কানে তুললেন আঙ্কেল ডিক। 'কে-থ্রি বলছেন? আমি ওয়াই-ফোর।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'এই একটা ছেলে। কাছে-পিঠেই থাকে। খবর আছে কোনও?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনলেন আঙ্কেল। মাঝে মাঝে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।...নিশ্চয়ই।...আমি জানাব আপনাকে।...ধন্যবাদ। ...না, এখনও কিছু না।...গুড-বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল।

'এত রাতে এখানে কেন তোমরা?' গলার স্বরটা কঠিন। দৃষ্টি কিশোরের বুক পকেটে রাখা হলুদ পেনসিলটার ওপর।

'একটা বিপদে পড়ে এসেছিলাম,' বলল কিশোর। 'মুসা হারিয়ে গেছে ওই দ্বীপের গুহায়।'

'মানে? ও কি আইল অভ ডিজাস্টারে গিয়েছিল?'

'আমরা সবাই গিয়েছিলাম। খনিমুখ দিয়ে ভেতরে নেমেই বন্দি হয়েছিলাম একদল লোকের হাতে। ওখানেই আপনার এই পেনসিলটা পেয়েছি আমরা। আমরা বন্দি হবার আগেই কাকাতুয়া সহ হারিয়ে গেছে মুসা গুহার গোলকধাঁধায়। কোনমতে মুক্ত হয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা তিনজন।' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে

ছিলেন আঙ্কেল কিশোরের মুখের দিকে, সম্বিত ফিরে পেয়ে ঢোক গিললেন একটা। 'আমাদের তাড়া করে...'

হাত তুলে ওকে থামালেন আঙ্কেল ডিক।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! না, কাঁপছ তুমি, বসো ওই চেয়ারটায়। এক এক করে উত্তর দাও আমার প্রশ্নের। প্রথম থেকে বলো দেখি। আমার বোট নিয়ে তোমরা...'

'নিকির বোট নিয়ে।'

'খনিতে নেমেছিলে?'

'হ্যাঁ। একেবারে সাগরের নীচ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। একটা গুহায় আলো দেখে ব্যাপার কী দেখতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময়ে ঝকড়-ঝকড় আওয়াজ উঠল আশেপাশে কোথাও।'

'কী বললে? ঝকড়-ঝকড় আওয়াজ? ছাপার মেশিনের মত?'

'হতে পারে,' একটু ভেবে বলল কিশোর। 'শব্দটা অনেকটা ওই রকমই। আমরা মনে করেছি খনির কাজ শুরু হয়েছে আবার। কিন্তু জনা কয়েক গুণ্ডামত লোক আমাদেরকে ধরে একটা ঘরে আটকে দিল।'

'এক-আধজনের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে?'

'এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা একজন লোক আছে ওখানে, নাম: স্মাগস। বিল আর জেক নামে আছে দুজন ষণ্ডা কিসিমের লোক। ওদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা তিনজন।'

'বুঝতে পেরেছি। তোমরা পালিয়ে আসতে পেরেছ, কিন্তু মুসা রয়ে গেছে খনির ভেতরেই। তোমরা আমার কাছে এসেছ, আমি কোনও সাহায্য করতে পারব কি না জানতে। এই তো?'

'হ্যাঁ। আপনি অপারগ হলে কপারটাউনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে আমাদের।'

'প্রথমে আমার কাছে এলে কেন?'

'মনে করেছি, আপনার সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতা আছে। আপনি হয়তো ওয়্যায়েরলেসে খবর দিতে পারবেন পুলিশকে। তা হলে আমাদের আর কপারটাউন পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে না।'

মাথা ঝাঁকালেন ডিক কার্টার।

'খুব ভাল করেছ তোমরা আমার কাছে এসে। হ্যাঁ, আমিও নেমেছিলাম ওখানে। কিন্তু কোনও লোক বা যন্ত্রপাতি দেখতে পাইনি। তোমরা দেখেছ, শিওর তো?'

'হানড্রেড পারসেন্ট!' বলে উঠল রবিন। 'লোক দেখেছি শিওর। যন্ত্রপাতি দেখিনি, তবে আওয়াজ শুনেছি।'

পার্টিশনের ওপাশে গিয়ে ওয়্যায়েরলেস সেটের নব ঘুরিয়ে কার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করলেন ডিক কার্টার। ছোট-ছোট শব্দ উচ্চারণ করে বিচিত্র এক ভাষায় কী কথা বললেন, একবর্ণও বুঝল না কিশোর। রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোর ও রবিনের দিকে চেয়ে হাসলেন।

'আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছ তোমরা। এক্ষুনি নৌকা নিয়ে রওনা হচ্ছি আমি। তোমরা এখন বাড়ি ফিরে যাও। সারাদিন অনেক ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে। মুসাকে...'

'আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' বলল কিশোর।

কথা বলতে বলতে একগাদা কাপড়ের নীচে কি যেন খুঁজছিলেন আঙ্কেল, ওখান থেকে একটা চামড়ার হোলস্টার বের

করে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলেন ওটার দিকে। 'আমার পিস্তলটা গেল কোথায়!' পাগলের মত কাপড়গুলো ওলট-পালট করে দেখলেন, সুটকেস হাতড়ে দেখলেন, কোথাও নেই পিস্তল।

রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন ডিক কার্টার।

'তা হলে···তা হলে আমার পরিচয় কি জেনে ফেলল ওরা?' ছেলেদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমাদের আর যাওয়ার দরকার নেই, ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে দ্বীপে।'

'বিপদে আমরা অভ্যস্ত, আঙ্কেল ডিক,' বলল কিশোর। 'আগেও কঠিন বিপদে পড়েছি আমরা। আর আজকের ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ আলাদা। বন্ধুর জন্যে যে-কোনও বিপদ মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ডিক কার্টার। তারপর বললেন, 'তা হলে চলে এসো। হাতে সময় নেই একদম।' শক্তিশালী একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডিক কার্টার কুটির থেকে।

পাথরের আড়ালে লুকানো বোটের কাছে চলে এল ওরা। আলো জ্বেলেই চেঁচিয়ে উঠলেন আঙ্কেল।

'আরে! সর্বনাশ! বোটের এই অবস্থা করল কে!'

কিশোর ও রবিন দেখল, শাবল বা কুড়াল মেরে বোটের তক্তা ভেঙে রেখে গেছে কেউ। এখনও পানি ঢুকছে কল-কল করে। এই বোটে করে দ্বীপে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

'তোমরা বলতে পারো কাজটা কার হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন ডিক কার্টার।

'না তো! কেউ এঞ্জন চাইছে না আপনি এই বোটটা ব্যবহার করেন,' বলল কিশোর। 'খুব সম্ভব আপনার পিস্তলটাও সরিয়েছে সে-ই। আপনার গোপন আস্তানা আর গোপন নেই ওদের কাছে। কিন্তু এখন মুসাকে উদ্ধারের কী উপায় করা যায়?'

'নিকির বোটটা আছে না নিউ ফোর্টে?' বললেন ডিক কার্টার।

'ঠিক বলেছেন,' বলল রবিন। 'জলদি চলেন। ওটা আবার ভেঙে নষ্ট করার আগেই রওনা হয়ে যাই!'

তাড়াতাড়ি হবে মনে করে গাড়িটা ব্যবহার করতে চাইলেন ডিক কার্টার। কিন্তু তেরপল সরিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠতে হল তাঁকে। ইঞ্জিনের ঢাকনা ভাঙা। কার্বুরেটর আর ডিস্ট্রিবিউটর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে কেউ। চলবে না গাড়ি।

থমথমে গম্ভীর হয়ে গেল আঙ্কেলের গোলগাল মুখটা। তেরপল নামিয়ে রেখেই লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন নিউ ফোর্টের পথে। ওঁর সঙ্গে প্রায় দৌড়ে চলল কিশোর ও রবিন।

নিউ ফোর্টের লাগোয়া ছোট্ট সৈকতে নামার আগে সাবধান করলেন ডিক কার্টার ওদের। 'আমরা যে ওর বোট নিয়েছি, সেটা যেন নিকি কিছুতেই টের না পায়।'

পাহাড় থেকে প্রায় দৌড়ে নেমে এল ওরা সৈকতে।

থমকে দাঁড়াল ওখানেই। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। যেমন বিস্মিত, তেমনি হতাশ।

নিকির বোট নেই।

এগারো

খেয়ে-দেয়ে কিশোর ও রবিন বেরিয়ে যেতেই জিনা গিয়ে ঢুকল ফুফার লাইব্রেরিতে। একমনে লিখছেন প্রফেসর অ্যালবার্ট স্যামুয়েলসন তাঁর গবেষণাধর্মী ইতিহাসের বই। আস্তে করে ডাকল জিনা।

চমকে চাইলেন প্রফেসর। 'কে? ও, আচ্ছা! কী চাও?'

'ওই যে আপনি বলেছিলেন আইল অভ ডিজাস্টার সম্পর্কে একটা বই দেবেন আমাকে পড়তে...'

'না তো!' এপাশ-ওপাশ মাথা দোলালেন ফুফা। 'এরকম কোনও কথা আমি বলতেই পারি না।'

'ওই যখন ম্যাপটা দেখতে দিলেন...'

'তোমার কাছে দিয়েছি নাকি ম্যাপটা? তাই তো বলি, গেল কোথায় ওটা। হ্যাঁ, দ্বীপের ম্যাপ আছে একটা, কিন্তু ওর ওপর লেখা কোনও বই নেই। থাকলে আমিই জানতাম সবার আগে। ব্যস, এবার যাও, কাজ করছি।'

'তা হলে কোন্ বইয়ের কথা বলেছিলেন? খুব ইন্টারেস্টিং?'

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন ফুফা। তারপর

বললেন, 'ওহ্-হো! মজার একটা বই আছে এই নিউ ফোর্টের ওপর। এটা দু-আড়াইশো বছর আগে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল, তা জানো? সমুদ্রের পাড় থেকে গোপন একটা সুড়ঙ্গ পথে যোগাযোগ ছিল এই দুর্গের।'

'জানি,' বলল জিনা। 'আমরা খুঁজে পেয়েছি সেই সুড়ঙ্গটা।'

'বলো কী! আমি তো ভেবেছিলাম ধসে-টসে বুজে গেছে ওটা বহু আগেই!'

সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের কথা মন দিয়ে আগাগোড়া খুঁটিয়ে শুনলেন তিনি জিনার কাছ থেকে। তারপর বললেন, 'তবে সমুদ্রের নীচ দিয়ে যে সুড়ঙ্গটা আইল অভ ডিজাস্টারে গেছে, ওটা আর এতদিনে আস্ত পাবে না।'

'এই দুর্গ থেকে?' ভুরু জোড়া কপালে উঠল জিনার। বলল, 'আরেকটা সুড়ঙ্গ···একেবারে সেই আইল অভ ডিজাস্টার পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ। ছিল। এখন যতদূর সম্ভব ছাদ ধসে গিয়ে পানিতে টই-টম্বুর হয়ে আছে গোটা সুড়ঙ্গ। ওই যে, ছয় নম্বর তাকে সবচেয়ে ডান দিকের মোটা বইটা। পড়ে আবার ফেরত দেবে, ঠিক আছে? যাও এবার, আমি কাজ করি।'

বইটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল জিনা। নিজের ঘরে গিয়ে বাতির পাশে বই নিয়ে বসল ও। খুবই পুরানো বই—হলুদ হয়ে গেছে পাতাগুলো। ছাপা অক্ষরগুলোও এতই পুরানো ধাঁচের যে পড়তে কষ্ট হয়। 'নথি' থাকলে অবশ্য গড়গড় করে পড়ে শোনাতে পারত, কিন্তু সে তো গেছে কিশোরের সঙ্গে আঙ্কেলের ওখানে।

নকশা বা ছবি আছে কি না দেখবার জন্য একটার পর একটা পাতা উল্টে চলল জিনা। নিউ ফোর্টের একটা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ও। যখন আস্ত ছিল, সত্যিই দেখার মত ছিল দুর্গটা।

একটা পৃষ্ঠার ডায়াগ্রাম দেখে চিনতে পারল জিনা ওটা। সাগর তীর থেকে দুর্গের নীচের সেলার পর্যন্ত পরিষ্কার আঁকা রয়েছে ওদের আবিষ্কার করা গুহাপথটা। আরও দু-তিনটে নকশা আঁকা পাতা আছে, কিন্তু লেখাগুলো এতই ঝাপসা যে ঠিক কী বোঝাতে চায় আন্দাজ করতে গিয়ে গুলিয়ে গেল ওর মাথাটা। নাহ্, এসব কাজ ওর না। কিশোর নিশ্চয়ই অতি সহজে বুঝতে পারবে এসব নকশার নিশানা। একটা কাগজের টুকরো দিয়ে পাতার ভাঁজে চিহ্ন রেখে এগিয়ে গেল ও আর কী আছে দেখতে দেখতে।

মুসার কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল জিনার। বেচারা এখন খনির ভিতর একা-একা খুঁজে বেড়াচ্ছে বেরোবার পথ। কিংবা ধরা পড়ে বন্দি হয়ে আছে কোনও চেম্বারে। হয়তো খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে পেটুক মানুষটা। ওর চোখ থেকে টপ্ করে একফোঁটা পানি পড়ল বইয়ের পাতায়।

কিশোর আর রবিন কি আঙ্কেল ডিকের সঙ্গে বোটে করে রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে? ওরা কি উদ্ধার করতে পারবে মুসাকে? কী ভাল হত না, এখন যদি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকত মুসা, কিংবা সবাইকে ধমক মারত ওর কাঁধে বসা কিকো?

বসার ঘরের পাশের বারান্দায় রবিনের গলার আওয়াজ পেয়ে লাফিয়ে উঠল জিনা। দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখল কিশোর আর রবিন ঢুকছে, মুসা নেই।

'মুসা কোথায়? ওকে উদ্ধার করতে পারনি?'

'যেতেই তো পারলাম না,' জবাব দিল রবিন। 'আঙ্কেলের বোট আর গাড়ি কে যেন ভেঙে চুরমার করে রেখেছে। এখানে এসে দেখি নিকির বোটটাও নেই। মনে হয় মাছ ধরতে বেরিয়েছে ও, কখন ফিরবে কে জানে! এখানেই আটকে গেছি আমরা, বুঝতে পারছি না কী করব।'

'ও, রবিন!' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'ফুফা বলছে, এখান থেকে আইল অভ ডিজাস্টারে যাওয়ার জন্যে নাকি একটা গুহা ছিল সাগরের নীচ দিয়ে। একটা বইয়ে নকশাও আছে সুড়ঙ্গটার।'

একটু পিছনে দেয়ালের আড়ালে ছিলেন ডিক কার্টার, কথাটা কানে যেতেই এগিয়ে এলেন সামনে।

'কোথায় বইটা?'

'এই তো, আঙ্কেল, আমার কাছে। এখুনি নিয়ে আসছি ঘর থেকে। ফুফা অবশ্য বলছেন, ওটা এতদিনে ছাদ ধসে ভর্তি হয়ে গেছে পানিতে...'

'না, তা হয়নি,' বলল কিশোর। 'হলে সাগরের লেভেল পর্যন্ত খনিটা ভরা থাকত পানিতে। যাই হোক, বইটা নিয়ে তুমি ওপরে চলে এসো, আমরা টাওয়ার-রুমে চললাম। আর আঙ্কেলের জন্যে যদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পার তা হলে খুব ভাল হয়। আজকের রাতটা উনি এখানেই থাকবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল জিনা। আঙ্কেলকে নিয়ে নিজেদের কামরায় চলে এল কিশোর ও রবিন। দশ

মিনিটের মধ্যেই খাবার ও বই নিয়ে হাজির হয়ে গেল জিনা।

খাবার রেখে প্রথমেই বই নিয়ে মগ্ন হয়ে গেলেন আঙ্কেল ডিক। কাগজের টুকরো দিয়ে চিহ্ন দেওয়া দেখে ওখানটাই খুলেছেন আগে। কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেই রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডিক কার্টার।

'এই তো!' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'এই তো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে গুহাটা আইল অভ ডিজাস্টারের দিকে। ওটা এখন পাথর খসে বুজে না গেলেই বাঁচা যায়।' পাশাপাশি দুটো ম্যাপ বারবার মিলিয়ে দেখলেন তিনি। ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখছে কিশোর ও রবিন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করলেন আঙ্কেল, 'তোমাদের কুয়োটা কত গভীর?'

'মানে, ইঁদারাটা?' বলল জিনা। 'অসম্ভব গভীর। মনে হয়, দ্বীপের ওই খনিমুখের মত গভীর। সমুদ্রতলের চেয়েও গভীর। কিন্তু পানিতে একবিন্দু লবণ নেই।'

কিশোরের দিকে চাইলেন ডিক কার্টার। মাথা দোলাল কিশোর। অর্থাৎ, আঙ্কেল কী বলতে চাইছেন বুঝতে পেরেছে সে।

'এই দেখো,' ম্যাপে আঙুল রেখে জিনা আর রবিনকে দেখালেন ডিক কার্টার। 'এইখানে গভীর একটা শ্যাফ্‌ট্ দেখা যাচ্ছে না? এটাই তোমাদের ইঁদারাটা। এই ইঁদারার গভীরের একটা ফোকর থেকে সমুদ্রের নীচ দিয়ে সোজা চলে গেছে সুড়ঙ্গটা; মিশেছে গিয়ে দ্বীপের নীচের আর সব সুড়ঙ্গের সঙ্গে।'

'কিন্তু ইঁদারার পানির ভেতর সুড়ঙ্গ থাকলে কী লাভ?' জানতে চাইল রবিন।

'পানির কিছুটা ওপরেই পাওয়া যাবে গুহামুখ, আমার বিশ্বাস,' বললেন আঙ্কেল। 'ম্যাপেও তাই দেখানো আছে। নিশ্চয়ই নীচে নামার কোনও ব্যবস্থা আছে–তোমরা কেউ লক্ষ করেছ?'

না। কেউ ওরা লক্ষ করেনি।

এতক্ষণে খাবারের দিকে দৃষ্টি গেল আঙ্কেলের। শুরু করে দিলেন তিনি, সেই সঙ্গে ম্যাপটাও দেখছেন খুঁটিয়ে। কেক, বিস্কিট আর ফলাহার দিয়ে ডিনার শেষ করে ধন্যবাদ দিলেন তিনি জিনাকে। তারপর বললেন, 'খুব সম্ভব ইঁদারাটা খুঁড়তে গিয়েই পাথরের গায়ে ফাটলটা চোখে পড়ে কারও। কিশোর, ঠিকই বলেছ তুমি, হয়তো দু-এক জায়গায় পাথর ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ছাদ ভেঙে সমুদ্রের পানি নেমে এসেছে, এটা হতেই পারে না। তা হলে ডুবে যেত খনির সব সুড়ঙ্গ, লবণাক্ত হয়ে যেত এই ইঁদারার পানি।'

'আমার মনে হয় না আজ রাতে নিকির বোট পাব আমরা হাতে,' বলল কিশোর। 'কাল খুব ভোরে যদি আমরা ইঁদারায় নেমে সুড়ঙ্গ-পথটা খুঁজে পাই, তা হলে দ্বীপে পৌঁছে মুসাকে উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব হবে না। আজ আর রাত জেগে ক্লান্ত না হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়,' বলে মুসার বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন আঙ্কেল ডিক।

'কাল কিন্তু আমাকে ছাড়া যাবে না তোমরা কেউ,' বলল জিনা। 'মুসা-উদ্ধার অভিযানে আমিও শরিক হতে চাই। কথা দিচ্ছি, মেয়েলি ন্যাকামি করে তোমাদের বিরক্ত করব না।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন আঙ্কেল, 'ঠিক আছে, জিনা। তোমাকে ফেলে আমরা যাব না। হলো এবার? যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেল জিনা।

দশ মিনিট পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল টাওয়ার-রুমের সবাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বেঘোরে ঘুমাল কিশোর ও রবিন সারাটা রাত। জানালায় একটা চোখ রেখে অনেকক্ষণ সিগারেট টানলেন আঙ্কেল ডিক, তারপর মুসার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব সকালে ঘুম ভাঙাল ওদের জিনা। ওর তৈরি ডিম ভাজা, মাংস ভাজা আর রুটি দিয়ে পেট পুরে নাস্তা খেয়ে নিল সবাই। ওকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, নিকি মাছ নিয়ে ফেরেনি এখনও। তবে যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

নিকির বোটের অপেক্ষায় না থেকে ইঁদারায় নামাই ভাল, স্থির করল ওরা। খাওয়া শেষ হতেই পিছনের আঙিনায় চলে এল সবাই। আঙ্কেল ডিক ঝুঁকে দেখলেন ইঁদারার তল দেখা যায় না।

'আমরা কি বালতিতে বসে নামব?' জানতে চাইল রবিন।

'না,' বলল কিশোর। 'আগে খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন দেখছি নামার ব্যবস্থা রয়েছে।' টর্চটা জ্বালতেই সবাই দেখতে পেল, দেয়ালের গায়ে আংটা বসানো রয়েছে, নেমে গেছে অতল তলে।

'আমি প্রথমে,' বললেন আঙ্কেল। 'তারপর একে একে তোমরা। খুব সাবধান! হাত ছেড়ে দিয়ে ঘাড়ে পোড়ো না আবার!

অনেক পথ নামতে হবে, কথাটা খেয়াল রেখো।'

আঙ্কেলের পিছন-পিছন কিশোর আর রবিনও নামল, কিন্তু জিনার কপাল খারাপ, ডাক দিলেন ওকে মলিফুফু। ফুফুর আদেশে লাইব্রেরিতে ফুফার নাস্তা পৌঁছে দিয়ে ও যখন ইঁদারার পাশে ফিরে এল, ততক্ষণে নামতে শুরু করেছে সবাই।

ওর ছায়া দেখে ডাকল কিশোর।

'চলে এসো, জিনা। আমরা অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

বারো

দেখা গেল, পঞ্চাশ-ষাট ফুট পরপর বিশ্রামের জন্য দেয়ালের গায়ে ফোকর তৈরি করা হয়েছে। দুজনের জায়গা হয় কোনমতে। কিশোর ও রবিনকে প্রথম ফোকরে বিশ্রাম নিতে বলে দ্বিতীয় ফোকরের খোঁজে আরও নেমে গেলেন আঙ্কেল ডিক।

জিনা নেমে আসতেই ওকে জায়গা দিয়ে কিশোর নেমে গেল নীচে ডিক কার্টারের কাছে। দু-তিন মিনিট করে বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে নামছে ওরা। নামছে তো নামছেই, কতবার থেমেছে তার ঠিক নেই। হাত ব্যথা করছে এখন। পাঁচ-ছয়শো ফুট নামবার পর কানে এল ঝর্নার কুল-কুল শব্দ। হাঁফ ছাড়ল কিশোর, এখনই

পাওয়া যাবে সুড়ঙ্গের মুখ।

মুখটা ছোট। পাশ কাটিয়ে নেমে যাচ্ছিল কিশোর, ডাকলেন ডিক কার্টার, 'এই যে, কিশোর! এদিকে!'

ছোট ফোকর গলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। ওখানেই রবিন ও জিনাকে পথ দেখাবার জন্য ওকে বসিয়ে রেখে সুড়ঙ্গের অবস্থাটা বুঝে দেখতে গেলেন আঙ্কেল। পৌঁছে গেল রবিন ও জিনা। পকেট-টর্চ জ্বেলে ঘড়িটা একবার দেখে নিল কিশোর—একঘণ্টা লেগেছে কেবল নামতেই। মিনিট দশেক পর ফিরে এলেন আঙ্কেল ডিক। বললেন, 'ভালই তো মনে হচ্ছে। বাতাসও খুব খারাপ না। আরও গভীরে ঢুকে কেমন অবস্থা হবে জানতে হলে চলো, রওনা দিই।'

আগে আগে চললেন আঙ্কেল ডিক, পিছনে লাইন দিয়ে ওরা। মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছেন তিনি যতদূর দেখা যায়।

সরু সুড়ঙ্গটা কিছুদূর উপরে উঠে তারপর বেশ চওড়া হয়ে গেল, ছাদটাও উঁচু হয়ে গেছে—এখন আর মাথা নিচু করে চলতে হচ্ছে না। পায়ের তলায় মাটি আঠালো, পিছল। গজ বিশেক থাকল সমান্তরাল, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল নীচে। যেখানটায় বেশি ঢাল, সেখানে ধাপ কেটে চলার সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পিছল মেঝেতে ভারসাম্য ঠিক রাখা কঠিন।

এঁকে-বেঁকে আধঘণ্টা চলার পর সমান্তরাল হয়ে গেল পথটা আবার। এখন আর পায়ের নীচে আঠালো মাটি কিংবা বালু নেই, চারপাশেই শক্ত, কালো পাথর—আলো ফেললে জায়গায় জায়গায় তামাটে রং ঝিলিক মারছে।

হঠাৎ-হঠাৎ খুবই সরু হয়ে যাচ্ছে প্যাসেজটা, কোনমতে একজন চলা যায়।

'প্রথম থেকেই এরকম, না কি সাগরের চাপে ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে পথটা?' জিজ্ঞেস করল রবিন—যদিও জানে এর উত্তর জানা নেই এখানে কারও।

'মনে হয় প্রথম থেকেই,' বলল কিশোর। 'বাতাস চলছে সুড়ঙ্গে, খেয়াল করেছ? পুরোপুরি বুজে যায়নি এ-সুড়ঙ্গ কোথাও। সাগরের চাপে সরু হলে এতদিনে কোথাও না কোথাও বন্ধ হয়ে যেত পথ।'

'যুক্তিতে তাই বলে,' বললেন আঙ্কেল ডিক। 'তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হলে সবটুকু পথ গিয়ে দেখে আসতে হবে।'

ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে সুড়ঙ্গটা। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম, মনে হচ্ছে কোনও-কোনও জায়গায় একেবারেই নেই। মাঝে-মাঝে চক্কর দিয়ে উঠছে মাথাটা। যেখানে ভাল বাতাস পেল, সে-সব জায়গায় কিছুক্ষণ থেমে জিরিয়ে নিল ওরা।

ক্লান্তিকর যাত্রা। কিছুদূর সোজা থাকে পথ, কিছুদূর চলে আঁকাবাঁকা হয়ে, খানিক উপরে ওঠে, আবার খানিক নীচে নামে। জিনা গোটাকয়েক টফি নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে, মুসার ভাগটা রেখে বেঁটে দিল সবাইকে চারটে-চারটে করে।

'বাহ্! দারুণ মজা লাগছে তো টফিটা!' বললেন আঙ্কেল ডিক। 'সঙ্গে মহিলা থাকার এই এক বিরাট সুবিধা। কখন কোন্‌টা ভাল লাগবে খেতে, বুঝতে পারে ওরা সবার আগে।'

'আর কতদূর, আঙ্কেল?' জানতে চাইল জিনা। 'আধাআধি

এসেছি?'

'একদম ধারণা নেই,' বললেন ডিক কার্টার। 'অন্ধের মত চলেছি। আরে! কী ওটা? হায়, হায়!'

'কোনটা?' আঙ্কেলের পিঠে ধাক্কা খেয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল রোড ব্লক। মনে হল, ছাদ ধসে বন্ধ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'কোথাও ফাঁক আছে,' বলল কিশোর। 'বাতাস কিন্তু চলছেই। চলেন, এগিয়ে দেখা যাক।'

দেখা গেল, ফাঁক সত্যিই আছে, কিন্তু সেটা গলে ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে কপাল ভাল, বড় পাথরটাকে চারজন মিলে ঠেলা দিতে দুলে উঠল সেটা। চট্ করে ওর নীচে একটা পাথরখণ্ড ঢুকিয়ে দিল কিশোর গোঁজ হিসেবে।

'এবার আরেকবার,' বলল ও, 'মারো জোয়ান, হেঁইও!'

আরেকটা পাথর গুঁজে ঠেকা দেওয়া হল। ওপাশে অনেকটা হেলে গেছে এবার ভারী পাথরটা। তৃতীয় ধাক্কায় হুড়মুড় করে পড়ল ওটা ওদিকের প্যাসেজে, গড়িয়ে চলে গেল কয়েক গজ। ব্যস, রাস্তা পরিষ্কার। ফাঁকটা দিয়ে ঘাড় গুঁজে চলে গেল ওরা ওপাশে।

'দেখেন, আঙ্কেল, রঙ বদলে লালচে হয়ে গেছে পাথরগুলো,' কিছুদূর এগিয়ে দেয়ালের গায়ে টর্চের আলো ফেলে বলল কিশোর। 'খনিতে প্রায় এসে পড়লাম নাকি?'

'মনে তো হচ্ছে তাই,' বললেন ডিক কার্টার। 'কতক্ষণ ধরে যে হেঁটে চলেছি খোদাই জানে। আমার তো মনে হচ্ছে কয়েক

যুগ ধরে হাঁটছি। সকালে ভরপেট নাস্তা না খেলে এতক্ষণে শুয়ে পড়তে হত রাস্তার ওপর। এখন আবার খিদে লেগে গেছে!'

'আমারও,' বলল রবিন।

'তা হলে এসো খানিকক্ষণ বসি,' বলল জিনা। 'গোটা কয়েক বাটারটোস্ট আর এক বোতল পানি আছে আমার ব্যাগে।'

ঝপাত করে বসে পড়লেন ডিক কার্টার।

'বলেছিলাম না? মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাত। কী দেবে, জলদি বের করো, জিনা। মরে গেলাম!'

দুটো করে বাটারটোস্ট পেল সবাই ভাগে। দুই ঢোক করে পানি খেল প্রত্যেকে, তারপর উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল।

'এখন থেকে আস্তে কথা বলব আমরা,' বললেন আঙ্কেল। 'নেহায়েত দরকার না পড়লে টর্চ জ্বালাব না। আমাদের আসল কাজ মুসাকে খুঁজে পাওয়া। পেলে কারও চোখে না পড়ে যে-পথে এসেছি সেই পথে আলগোছে কেটে পড়া। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

কিছুদূর গিয়ে চাপা গলায় বললেন ডিক কার্টার, 'ভাল কথা! ম্যাপটা সঙ্গে এনেছ তো, কিশোর? বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।'

'এনেছি,' বলল কিশোর। 'দেব আপনার হাতে?'

'দাও। একটু পরেই লাগবে ওটা।'

বলতে বলতেই শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। চওড়া হতে হতে মিশে গেছে খনির শেষাংশের সঙ্গে। সবাই বুঝল, এই পর্যন্ত খোঁড়ার পর শেষ হয়ে যায় মওজুদ তামা।

ম্যাপটা নিয়ে একটা পাথরের উপর ওটা বিছালেন ডিক কার্টার, তারপর বাম হাতের তালু দিয়ে টর্চের মুখটা আড়াল করে অন করলেন সুইচ। ম্লান আলোয় চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি ম্যাপটা।

'এই দেখো, সমুদ্রের নীচের এই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে আমরা ঠিক এইখানে রয়েছি এখন,' একটা আঙুল রাখলেন তিনি ম্যাপের এক জায়গায়। 'এবার বলো দেখি, খনিমুখ দিয়ে তোমরা কোথায় নেমেছিলে?'

ম্যাপের উপর তর্জনী রাখল কিশোর।

'ঠিক এইখানে নেমে এই প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এই পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা; এখানেই উজ্জ্বল আলো দেখেছিলাম, মেশিনের আওয়াজ পেয়েছিলাম। তারপর ধরে এইখানে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল ওরা আমাদের বিকেল পর্যন্ত।'

'বুঝলাম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে মুসাকে। প্রথমে এই শর্টকাট রাস্তা ধরে যাব আমরা মেইন প্যাসেজে, যতটা সম্ভব আওয়াজ না করে। চলো এবার।' ম্যাপ ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন আঙ্কেল।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে সামান্য যেটুকু আলো বেরোয়, তারই সাহায্যে এগোল ওরা শর্টকাট সুড়ঙ্গ পথে।

'শশ্‌শ্‌!' দুপাশে দুহাত তুলে থামার ইঙ্গিত করলেন আঙ্কেল ডিক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। আলো নিভিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কী যেন শুনতে পেলাম। মনে হল পায়ের আওয়াজ!'

কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। মাথার উপর থেকে সমুদ্রের অস্পষ্ট ছলাত-ছলাত শব্দ আসছে কেবল। রবিনের মনে হল ও-ও কিছু শুনতে পেল। কারও পায়ের ধাক্কায় ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর কিট-কিট আওয়াজ তুলে কিছুদূর গিয়ে থামল।

তারপর সব একদম চুপ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাবধানে এগোল ওরা আবার। চার কদম গিয়েই আবার থামতে হল—এবার সবাই শুনতে পেল কারও শ্বাস ফেলার শব্দ।

দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু মনে হয় সেই লোকটাও আটকে রেখেছে দম। সামান্যতম শব্দও নেই। অশরীরী একটা অনুভূতি।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল ওরা। হাতড়ে হাতড়ে দেয়াল ধরে এগোতে হচ্ছে। সুড়ঙ্গের দেয়ালটা শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ কোনও মোড়ে পৌঁছেছে ওরা। ওপাশে কী আছে দেখবার জন্য হাত বাড়িয়েই আঁতকে উঠলেন আঙ্কেল। কে যেন ঠিক ওভাবে দাঁড়িয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে এপাশে কী আছে।

খপ করে ধরে ফেলল দুজন দুজনের হাত। ঝটপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে ঠিক সামনে। ধস্তাধস্তি করতে করতে দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। কেউ কথা বলছে না, ফুস-ফাস আর হুটোপুটির আওয়াজ আসছে কেবল। একবার 'উঃ!' বলে উঠলেন আঙ্কেল।

টর্চটা জ্বালবে কি না বুঝতে পারছে না কিশোর।

তেরো

ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে পা ব্যথা হয়ে গেল মুসার।

ও জানে না, পালিয়ে খনিমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওর বন্ধুরা প্রাণ হাতে করে। এমন কী, ওরা যে বন্দি হয়েছিল সে কথাও জানা নেই ওর। কাকাতুয়া নিয়ে হারিয়ে গেছে ও গুহার জঙ্গলে।

ভয় লাগছে ওর। ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে টর্চের, অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে আলো। আলো ছাড়া এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কী ঘটবে ওর কপালে কে জানে! যতই ঘুরছে ততই সেঁধিয়ে যাচ্ছে ও পুরানো, পরিত্যক্ত খনিগুহার জটিলতায়।

কিকোর খোঁজে অন্যদিকে সরে না গেলে আজ ওর কপালে এই ভোগান্তি হত না। কেন যে এই বোকামি করতে গেল! নিজেরই সামান্য ভুলে এখন হারিয়ে গিয়ে ঘুরে-ঘুরে খাবার ও পানির অভাবে মরতে হবে ওকে।

'বুঝলি, চিরতরে হারিয়ে গেছি,' বলল ও কিকোকে। 'মেইন প্যাসেজ থেকে কতদূরে আছি আল্লাই মালুম।'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা খনিমুখ দেখতে পেল ও গুহার ছাদে। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। এইত্তো! অনেকগুলো

মুখ দেখেছিল ওরা উপরে। এটা দিয়ে উপরে উঠে যেতে পারলে অন্তত এই নরক থেকে তো বাঁচা যাবে! কিন্তু কাঠের বা দড়ির মই খুঁজতে গিয়ে দমে গেল ওর মনটা। কোনও কালে হয়তো ছিল, এখন কোনরকম মইয়ের চিহ্নও নেই কোথাও। কয়েকশো ফুট উপরে খোলা আকাশ আর দিনের আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওঠার কোনও উপায় নেই।

'মেয়ে হলে এখুনি ডুকরে কেঁদে উঠতে পারতাম,' বলল ও কিকোকে। 'কিন্তু যেহেতু আমি ছেলে, কাঁদার উপায় নেই, মুচকি হেসে মেনে নিতে হবে দুর্ভাগ্যকে।'

নরম গলায় ওকে সান্ত্বনা দিল কিকো, 'দরজাটা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার!'

হাসল মুসা। বলল, 'তুই নিজেই একটা গাধা!'

প্রত্যুত্তরে কিকো ওর কানে কানে বলল, 'খাও, লক্ষ্মী ছেলে; খাও তো, সোনা।'

খিদে লাগলে বলে ও এই কথাটা। চট্ করে পকেটে হাত দিয়ে একমুঠ সূর্যমুখীর বিচি বের করে ধৈর্য ধরে খাওয়াল মুসা পাখিটাকে, হ্যাভারস্যাক থেকে পানির বোতল বের করে ঢালল ওর হাঁ করা ঠোঁটের ফাঁকে। তারপর নিজেও সেরে নিল লাঞ্চটা। ব্যস, সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত।

ঘুরতে-ঘুরতে সন্ধ্যার দিকে মুসার মনে হল কাছাকাছিই কোনও গুহায় কথা বলছে লোকজন। গলার আওয়াজ কিকোর কানেও গেল। উত্তেজিত হয়ে বেশ কিছু ধমক-ধামক দিল ও লোকগুলোকে। এই ধমক শুনেই ওরা কিশোর, রবিন আর জিনার

পিছন ছেড়ে অন্যদিকে খুঁজতে লেগেছিল। কিন্তু মুসা তখন পথ হারিয়ে ঢুকে পড়েছে আরেক গুহায়।

সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ওর মনে হল সেই চওড়া প্যাসেজে এসে পড়েছে ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না, কারণ টর্চে আলো এখন প্রায় নেই বললেই চলে। পাঁচ ফুট দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে।

কিন্তু জেনারেটরের গুঞ্জনটা ঠিকই শুনতে পাচ্ছে। টর্চ নিভিয়ে ওইদিকে হাঁটতে শুরু করল ও ধীর পায়ে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মাথার উপর সমুদ্রের সেই পরিচিত ঝপাস-ঝপাস আওয়াজটা শুনতে পেল ও আবছা ভাবে। আর কিছুক্ষণ পর খোঁড়াখুঁড়ির খটর-মটর আওয়াজ শুনতে পাবে বলে মনে হল ওর। ঠিক, এইখানেই কোনও সুড়ঙ্গে উজ্জ্বল আলো দেখেছিল ওরা।

বন্ধুদের দেখা পাবে, সেই আশায় দ্রুতপায়ে এগোল এবার মুসা। একটা মোড় ঘুরেই দেখতে পেল সেই আলো। এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গ ধরে। উজ্জ্বল বাতি দেখেই চট করে থেমে পিছিয়ে গেল ও কয়েক পা। সকালে যেখানে বাতি ছিল, লোক ছিল না এই কামরায়; এখন সাত-আটজন দেখা যাচ্ছে। দু-জন কী যেন বের করছে কাঠের বাক্স থেকে।

সকালে কোন্ গলি ধরে কিশোরের পিছনে গিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছিল দল থেকে, চিনতে পারছে ও এখন পরিষ্কার। ভাবছে, গেল কোথায় কিশোররা? ওকে রেখেই ফিরে গেছে দুর্গে? লোক নিয়ে ফিরে আসবে ওকে খুঁজতে? ইশ্! নিজ দোষে কী দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলেছে ও বন্ধুদের! না কি ওরাও ওরই মত পথ হারিয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকার গুহায়-গুহায়?

এতক্ষণ আঁধারে থেকে হঠাৎ আলো দেখে ভয় পেয়েছে কিকো। কুঁকড়ে নিচু হয়ে বসে আছে মুসার কাঁধে। একদম চুপ। দেখছে কে কী করে।

কাঠের বাক্স থেকে বের করা হল আট-দশটা খাবারের ক্যান। ক্যান খুলে কয়েকটা প্লেটে ঢালল ওরা মাছ, মাংস, ফল, বাদাম। তারপর মুসাকে না দিয়ে নিজেরা খেতে শুরু করল। মুসা বুঝল, এই জন্যই খনির কাজ আপাতত বন্ধ, আওয়াজ নেই।

ওদের খাওয়া দেখে খিদেতে জ্বলে উঠল মুসার পেট। একটা ক্যান পেলেও হত। এগিয়ে গিয়ে একটিন খাবার চাইবে নাকি ওদের কাছে? নাহ্, লোকগুলোর চেহারা পছন্দ হচ্ছে না ওর। তা ছাড়া কিশোর বলেছে: গোপনে কিছু একটা করছে ওরা এখানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে--কাজটা আইনসঙ্গত হতেই পারে না।

অনেকক্ষণ লাগিয়ে গল্প করতে-করতে খাচ্ছে ওরা। হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। কী বলছে শোনা যাচ্ছে না। খাওয়া শেষ করে চলে গেল ওরা আরেকটা প্যাসেজে। একটু পরেই শুরু হয়ে গেল খড়র-মড়র আওয়াজ। শুরু হয়ে গেছে কাজ।

পা টিপে বাক্সগুলোর দিকে এগোল মুসা। সবগুলোতেই টিনের খাবার। এবার লোকগুলো যেদিকে গেছে সেইদিকে চলল ও সাবধানে। মাত্র সাত-আটজন খনি শ্রমিক এত আওয়াজ করছে কী করে দেখা দরকার। বাঁকের কাছে গিয়ে আস্তে করে মাথাটা সামনে বাড়াল ও।

বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পাঁচ-ছয়টা মেশিন চলছে পাশের

গুহায়, সেই কারণেই এই বিচিত্র শব্দ। কিন্তু এগুলো তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, খনি খুঁড়ছে কী দিয়ে? খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি কোথায়?

এত বড়-বড় মেশিন খনিমুখ দিয়ে এত নীচে নামালই বা কী করে! নিশ্চয়ই আস্ত নামানো যায়নি, খুলে পার্টগুলো নামিয়ে এনে এখানে আবার জোড়া লাগানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে কি তামা গলানোর কাজ হচ্ছে?

একজন লোক কাজ ছেড়ে এক আঙুল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম ঝরাল, তারপর সোজা মুসার দিকে এগোল। চট্ করে সরে গেল মুসা, এদিক-ওদিক চেয়ে দেয়ালের গায়ে একটা অন্ধকার গর্ত মত জায়গা দেখে ঢুকে পড়ল সেখানে। এক মগ পানি ঢেলে নিয়ে ফিরে গেল লোকটা।

একটা দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল মুসা দুই মিনিট। তারপর আবার বাইরে যাবে বলে যেই সোজা হতে গেল, অমনি নড়ে উঠল দেয়ালটা। চমকে গিয়ে টর্চ জ্বালল মুসা। দেয়াল না, একটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ছিল ও এতক্ষণ। ওপাশে মাঝারি আকারের একটা কামরা। ম্লান হয়ে আসা টর্চটা নিভিয়ে গুহা থেকে বেরোতে যাবে, এমন সময় কাছেই পায়ের আওয়াজ পেয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল মুসা ভিতরের ঘরটায়। আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। পায়ের শব্দটা গুহার সামনে দিয়ে চলে গেল। ঘরে কী আছে দেখবে বলে টর্চটা জ্বালল ও।

কাগজের বান্ডিল। থরে থরে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য বান্ডিল। পঞ্চাশ-ষাটটা বান্ডিল একত্রে সাজিয়ে কষে বাঁধা। এরকম একত্রে

বাঁধা প্যাকেট রয়েছে কয়েক হাজার। ঘরের বেশির ভাগটাই ছাদ পর্যন্ত টাল দেওয়া এই রকম প্যাকেটে বোঝাই। বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মুসা। আরে! টাকা না ওগুলো?

ভাল করে তাকিয়ে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ও। থরে থরে সাজানো রয়েছে আমেরিকান ডলার। দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশো আর পাঁচশো ডলারের নোট আলাদা আলাদা ভাগে থাক দিয়ে রাখা।

বার কয়েক চোখ ডলে আর গায়ে চিমটি দিয়েও ওগুলোকে দূর করা গেল না—যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে ঘরভর্তি টাকা। তারমানে, স্বপ্ন দেখছে না ও। মাটির নীচের এক অন্ধকার ঘরে বিশাল অঙ্কের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছে মুসা।

কয়েকটা হাতে নিয়ে ডলে দেখল ও—ঝকঝকে নতুন, তাজা, কড়কড়ে নোট।

চোদ্দো

কার এগুলো? মাটির নীচের এই গুহায় কেন এসব? এত টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে এখানে ফেলে রেখেছে কেন?

হয়তো তামা বিক্রি করে এতই রোজগার হয়েছে যে রাখবার জায়গা পাচ্ছে না এই লোকগুলো। মুগ্ধ মুসা চারদিকে টর্চের ম্লান

আলো ফেলছে। এতই বিস্মিত যে, টেরই পায়নি কেউ গুহায় ঢুকে চলে এসেছে দরজা পর্যন্ত। আঁতকে উঠল, যখন হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা।

চমকে গেছে লোকটাও। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। চোখ দুটো মনে হচ্ছে কোটর ছেড়ে এখুনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে খপ্ করে ধরল সে মুসার হাত। টেনে নিয়ে চলল যেখানে প্রবল আওয়াজ তুলে চলছে পাঁচ-ছয়টা মেশিন।

'এই দেখো!' প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়ল লোকটা। 'তাকাও এদিকে! স্টোর-রুমে পেয়েছি এই ফেলে শয়তানটাকে!"

একসঙ্গে থেমে গেল সবকটা মেশিন। ছয়-সাতজন ঘিরে ধরল মুসাকে। একচোখে কালো পট্টি বাঁধা লোকটা এগিয়ে এল মারমুখো ভঙ্গিতে। লোকটা মুসার দুই কাঁধ ধরে এতই জোরে ঝাঁকাল যে, ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই কষ্ট হল কিকোর। চোখা ঠোঁটটা ঘ্যাঁচ করে বিঁধিয়ে দিল সে স্মাগসের বাহুতে।

'বাপরে!' বলে লাফিয়ে সরে গেল স্মাগস।

এদিকে দম হারিয়ে মেঝেতে বসে পড়েছে মুসা। পাখা ঝাপটে উড়ছে কিকো মাথার উপর।

টেনে তোলা হল ওকে। দূর থেকেই চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করল স্মাগস, 'বাকি শয়তানগুলো কোথায়? কে পাঠিয়েছে তোমাদের? কী করছ তোমরা এখানে? কতটা কী জানতে পেরেছ? —এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে এখন।'

'হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি,' বলল মুসা। 'জানি না ওরা কোথায়।'

'কে পাঠিয়েছে তোমাদের?' ছুটে এল প্রশ্নবাণ। 'নিশ্চয়ই তোমরা নিজেরা নিজেরাই খনিতে নামোনি?'

'নিজেরাই এসেছিলাম। পিকনিক করতে এসে পুরনো খনিটা দেখব বলে নেমেছিলাম নীচে। ওরা কে কোথায় আছে কিচ্ছু জানি না আমি। ঘুরতে ঘুরতে এই ঘরে ঢুকে দেখি কেবল টাকাই টাকা। এখানে এত টাকা স্তূপ করে রাখার কী মানে?'

'কিন্তু একটা গোলমাল হয়েছে কোথাও,' বলল স্মাগস। কড়া চোখে তাকাল মুসার দিকে। 'যতটা বলছ, তার চেয়ে অনেক বেশি জানো তুমি, মাস্টার কালুয়া। যা জানো, ঝেড়ে কাশো! তা নইলে দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য হবে না তোমার আর কোনদিন। বোঝা গেছে?'

গলার স্বর ও বলবার ভঙ্গিতে ঠিকই বুঝে নিল মুসা। কাঁপন উঠে গেল ওর বুকের ভিতর। ওর কাঁধে ফিরে এল কিকো, কটমট করে চেয়ে রয়েছে স্মাগসের দিকে।

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না আমি,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা। 'আমরা চারজন পিকনিক করতে এসেছিলাম দ্বীপে, দড়ির মই দেখে নেমেছিলাম নীচে, ভেতরে আওয়াজ শুনে আমরা ভাবলাম খনিতে আবার বুঝি কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বন্ধুদের হারিয়ে ফেলি আমি ওপাশের ওই গলিতে ঢোকার পরপরই। সারাদিন গুহায়-গুহায় ঘুরছি খনির ভেতর, ওরা কে কোথায় কিচ্ছু জানি না। এই একটু আগে আবার খুঁজে পেয়েছি এই প্যাসেজ। ব্যস, আর কিছুই জানি না আমি।'

'আমার ধারণা আরও অনেক কিছুই জানো তুমি, খোকা,' বলল বিল। 'স্টোর-রুমে ঢুকেছিলে কেন?'

'সব ঘরেই ঢুকছি আমার বন্ধুদের খোঁজে। ওখানে টাকা দেখে বুঝলাম, অনেক টাকা রোজগার করছেন আপনারা কপার বিক্রি করে।'

'নাহ্, এ খালি কথা প্যাঁচাচ্ছে!' বলল জেক। 'না খাইয়ে আটকে রাখা যাক এটাকে, কী বলো? খিদেতে আধমরা হলেই গড়গড় করে বেরিয়ে আসবে সব কথা। অবশ্য আচ্ছা মত ধোলাই দিলেও একই কাজ হবে।'

ভয় পেয়েছে, কিন্তু সেটা গোপন করে জোর দিয়ে বলল মুসা, 'যা জানি সবই তো বললাম। আর কী জানার আছে এখানে? আমার ওপর জোর-জুলুম করে কীসের কথা বের করতে চান আপনারা?'

'ওকে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রাখো না খাইয়ে,' কঠোর গলায় বলল স্মাগস। 'তারপর হাজির করা যাবে মিস্টার বিগের সামনে।'

খপ্ করে মুসার একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল বিল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিল মুসা। ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল বিল। আজ সকালে যে ঘরটায় আটকানো হয়েছিল কিশোরদেরকে, সেই ঘরের সামনে গিয়ে দরজার তালা খুলল ও। মুসার ঘাড় ধরে ঠেলে ঘরে ঢোকাতে যাচ্ছে দেখে রাগে ফেটে পড়ল কিকো। এত কষ্ট করে সে পেলে-পুষে মানুষ করছে যে বাচ্চাটাকে, তাকেই কিনা মারতে চায় ব্যাটা! লাফিয়ে শূন্যে উঠে তীক্ষ্ণ, বাঁকা ঠোঁট দিয়ে প্রচণ্ড এক ঠোকর মেরে দশ গ্রাম মাংস তুলে নিল সে বিলের কপাল থেকে। তারপর ভয়ঙ্কর এক চিৎকার ছেড়ে দুই পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল ওর গাল দুটো।

'বাবা রে!' হাত থেকে লণ্ঠন ছেড়ে দিয়ে হাউ-মাউ করে উঠল বিল ব্যথায়। দুই হাতে মুখ ঢেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে আক্রমণ থেকে। চিৎকার করে লোক ডাকছে। 'গেলাম, গেলাম—বাঁচাও!'

বাতি নিভে যেতেই সাঁত করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা বাইরে। তারপর ছুটে গিয়ে লুকাল সামনের বাঁকে। অন্ধকার ঘরে কোথায় মুসা টের পেল না কিকো, টেবিলের উপর গিয়ে বসল।

'কী হলো! দরজাটা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার!'

কে বলল কথাটা টের পেল না বিল, হয়তো ভাবল তার বন্ধুদের কেউ বলেছে—চট্ করে দরজাটা লাগিয়ে দিতে গিয়ে কানে এল: আহা রে, বেচারা! খুব লেগেছে বুঝি? হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো! রুমাল কোথায়...দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে মেরে দিল তালা। ধরেই নিয়েছে ভিতরে রয়েছে মুসা।

'আটকে দিয়েছ?' জানতে চাইল জেক। 'অমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিলে কেন? কী হয়েছিল? বাতি কোথায় তোমার?'

'আর বোলো না!' ক্ষোভের সঙ্গে বলল বিল, 'একতাল গোস্ত তুলে নিয়েছে আমার কপাল থেকে! ওই বদমাশ পাখিটা! নখ দিয়ে আঁচড়ে রক্ত বের করে দিয়েছে গাল থেকে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল জেক।

'ছেলেটা কোথায়?' প্রশ্ন করল স্মাগস।

'ভেতরে। কথা বলছে নিজের সঙ্গে নিজেই। শুনে আমার ধারণা, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।'

সবাই কান পেতে শুনল ভিতরে কথা গেছি এবার! ইশ্‌শ্, এত্তো আঁধার! খাই

'ভয় পেয়েছে ব্যাটা!' বলে

'এখনও তো জানেই না, কী ঘটতে চলেছে ওর কপালে!'

ফিরে গেল ওরা মেশিনের কাছে। আবার শুরু হল আওয়াজ। পা টিপে দরজার সামনে চলে এল মুসা। কিকোর জন্য বেঁচে গেছে ও আজ, নইলে কী যে ছিল ওর কপালে কে জানে। এবার ওকে বের করে নিয়ে সোজা চলে যাবে ও বড় খনিমুখটার নীচে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাবে এই দোজখ থেকে।

কিন্তু কপাল খারাপ—চাবিটা নেই দরজার সঙ্গে, নিয়ে গেছে ওদের কেউ। ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজেই বন্দি হয়েছে কিকো। ওকে কেউ মুক্ত না করলে আটকেই থাকবে ওখানে।

লোকগুলো বদ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে মুসা, খারাপ কিছু চলছে এখানে। টাকাগুলোও এসেছে অসৎ পথে। মেশিনগুলোও চালানো হচ্ছে বেআইনি কোনও কাজে।

সাবধানে এগোল মুসা সামনে। টর্চ জ্বালাতে ভয় পাচ্ছে। বড় খনিমুখটা পেয়ে গেলে মই বেয়ে উপরে উঠে যাবে ও। হয়তো ওর জন্য অপেক্ষা করছে উপরে আর সবাই। না কি চলে গেছে ওরা ওকে ফেলে? এখন দিন, না রাত?

হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল মুসা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একটা গুহায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। ওখানেই শক্ত মেঝেতে অস্বস্তিকর ভাঙা-ভাঙা ঘুমে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকল ও কয়েক ঘণ্টা। ওদিকে প্রভুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা বন্ধ ঘরে আটকে গিয়ে রেগে গেল কিকো প্রথমে, দিশেহারা বোধ করল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল—এই বুঝি আদর করে ডাকবে ওকে মুসা। শেষে মৃদুকণ্ঠে 'খাও, সোনা' বলে পাখার নীচে মাথা গুজে ঘুমিয়ে পড়ল সে-ও।

ঘুম ভাঙতেই হাত বাড়িয়ে কিকোকে খুঁজল মুসা। তারপর মনে পড়ে গেল সব কথা।

অনেককিছুই জানে ও এখন। লুকানো কোটি-কোটি ডলারের কথা জানে, ওই অদ্ভুত মেশিনগুলোর গোপন কর্মকাণ্ডের কথা জানে, এখানে যারা কাজ করছে তাদের বদ চরিত্রের কথা জানে। কাজেই ওর এখন প্রথম কাজ এখান থেকে যে-করে হোক পালানো, তারপর সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে সব জানানো।

আবার শুরু হল ওর অবিরাম হাঁটা। টর্চের আলো কমতে কমতে এখন এমন অবস্থা: যেন প্রকাশ্যে নয়, জ্বলছে মনে মনে। একসময়ে নিভেই গেল, ঝাঁকিয়ে বা থাবড়া মেরে কোনও লাভ হল না।

চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ভয় লেগে উঠল মুসার। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে ও, দেয়াল পেলে সেটা ধরে এগোচ্ছে, মনে ক্ষীণ আশা: হয়তো সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যাবে উপরে ওঠার শ্যাফটটা।

এইভাবে অন্ধের মত অনেকক্ষণ হাঁটার পর ওর মনে হল কীসের যেন একটা শব্দ শোনা গেল। থেমে দাঁড়িয়ে কান পাতল মুসা। না, কিছু না।

আবার দু-পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ও। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে খুব কাছেই রয়েছে কোন লোক। শ্বাস টানার শব্দ না? ওটা মানুষ তো? দম আটকে অপেক্ষা করছে মুসা। কিন্তু ওর মনে হল লোকটাও আটকে রেখেছে দম।

আর এক পা এগিয়েই ধাক্কা খেল ও কারও সঙ্গে। কে! বিল না জেক? না কি স্মাগস? জাপটে ধরে ফেলেছে লোকটা ওকে। ঝাপটা-ঝাপটি করেও ছুটতে না পেরে ল্যাঙ মেরে মেঝেতে ফেলে

দিল ও লোকটাকে, তবু নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

'ছাড়! ছাড়লি!' হুমকি দিল মুসা। 'নইলে এলোপাতাড়ি ঘুসি শুরু করব বলে দিলাম!'

কয়েক সেকেন্ড যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল আক্রমণকারী। তারপর একটু দূর থেকে জ্বলে উঠল শক্তিশালী টর্চ।

'আরে! মুসা! তুমি কোত্থেকে?' বলে উঠল টর্চের পিছন থেকে কিশোরের কণ্ঠস্বর।

নড়ে উঠল মুসার গায়ের ওপর চেপে বসা আঙ্কেল ডিক। ছুটে এসে দুপাশ থেকে মুসার হাত ধরে উঠে বসতে সাহায্য করল জিনা আর রবিন।

'ব্যা-ব্যাপারটা কী! সত্যি, না স্বপ্ন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মুসা। উঠে বসে এদিক-ওদিক চাইছে ও। 'তোমরা কি সত্যিই আছো, না কি এসব ঘোরের মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম আমার?'

'ঠিকই দেখছ, মুসা। কিঙ্কো কোথায়?' বলল জিনা।

'অ্যারেস্টেড!' বলল মুসা। 'ওকে একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি করে রেখেছে লোকগুলো। ওরা ভেবেছে আমিও আছি ভেতরে। কিন্তু তোমরা কী করছ এখানে? আঙ্কেলকেই বা পেলে কোথায়? এখনও বেরোতেই পারোনি এখান থেকে? আমি তো ভেবেছি ফিরে গিয়ে আমাকে খোঁজার জন্যে লোকজন নিয়ে আসছ তোমরা।'

'তাই তো করেছে ওরা,' বললেন আঙ্কেল ডিক। 'বন্দি করা হয়েছিল ওদেরকেও। কৌশলে পালিয়ে ডাঙায় ফিরে গিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে। এবার শোনা যাক তোমার কথা। মনে হচ্ছে, একদিন-একরাতে অনেক কথা জমে গেছে তোমার পেটে? চলো, গুহার একটু ভেতর দিকে সরে গিয়ে বসি আমরা কোথাও।'

'কাল দুপুর থেকে এ-পর্যন্ত অদ্ভুত কিছু খবর ছাড়া আর কিচ্ছু পেটে পড়েনি আমার।'

'এখুনি পড়বে,' বলল কিশোর। 'তুমি খবর কিছু বের করে দিয়ে খালি করো পেট, জিনা খাবার বের করছে ব্যাগ থেকে।'

'অ্যাঁ? খাবার আছে?' আড়চোখে দেখল মুসা, পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে কী যেন করছে জিনা : 'আহা-হা! এটাই তো আমার জন্যে সেরা খবর!'

জিনাকে চারটে বাটার টোস্ট আর আটটা টফি বের করে দিতে দেখে হাসলেন আঙ্কেল। পেটুক মুসার প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ মমতার পরিচয় যত পাচ্ছেন, ততই মুগ্ধ হচ্ছেন তিনি। এ-জীবন তো আর ফিরে আসবে না। মিলে-মিশে চমৎকার কাটাচ্ছে এরা কৈশোরের অপূর্ব সুন্দর, স্বপ্নের মত রঙীন দিনগুলো।

আগে খাওয়া, তারপর কাজ। খেতে-খেতে প্রশ্ন করে-করে রবিনের কাছ থেকে জেনে নিল ও বাকি তিন জনের কথা। আঙ্কেল ডিকের বোট আর গাড়ি ভেঙে নষ্ট করবার কথা শুনে অবাক হল মুসা।

'তা হলে আবার নিকির বোট নিয়ে...'

'নাহ্, চেয়েছিলাম নিতে, কিন্তু আমরা নিউ কোর্টে পৌঁছে দেখি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে নিকি।'

'তা হলে এখানে এলে কী করে তোমরা?' খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল মুসার। 'সাঁতার কেটে?'

'দুর্গ থেকে সমুদ্রের নীচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে দ্বীপ পর্যন্ত। খুব বাজে রাস্তা, আর কোনও উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে ওই পথেই এসেছি আমরা। এবার শোনা যাক তোমার কথা।'

'আমার কাছে যে খবর আছে শুনলে চমকে যাবে' বলল মুসা শেষ টফিটা মুখে দিয়ে। 'কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা কী খুঁজে পেয়েছি আমি!'

'বলে ফেলো না, তারপর দেখব কল্পনা করা যায় কি না,' বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়াটা কোন্ দিকে যাচ্ছে দেখে নিয়ে টর্চ নিভিয়ে দিলেন আঙ্কেল ডিক।

'ডলার! বুঝলেন? লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি ডলার! টাল দিয়ে রাখা আছে একটা ঘরে। সব কড়কড়ে নতুন নোট!'

'নোট?' একটা পাথরে হেলান দিয়েছিলেন, মুহূর্তে সিধে হয়ে গেলেন আঙ্কেল। 'পেপার মানি? তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।' পকেটে হাত দিল মুসা। কয়েকটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বের করে বাড়িয়ে দিল আঙ্কেলের দিকে। 'বিশ্বাস না হয় আপনি নিজের চোখে দেখুন। আমি যখন এগুলো পরীক্ষা করছি, ঠিক তখুনি একজন লোক ঘরে ঢুকে ধরে ফেলল আমাকে। অল্পগোছে পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম এগুলো, নইলে চোর মনে করে মার লাগাত ব্যাটারা। যা একেকটার চেহারা!'

গভীর মনোযোগে নোটগুলো পরীক্ষা করলেন আঙ্কেল, হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। চাপড় দিলেন মুসার পিঠে।

'আমরা পাঁচ বছরের চেষ্টায় যা খুঁজে পাইনি, তুমি দেখছি একদিনেই আবিষ্কার করে ফেলেছ সেটা। দারুণ, মুসা! তারপর? ওর কী দেখলে?'

প্রশংসা পেয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে গেল মুসার।

'পাঁচ-ছয়টা মেশিন। নানান আকার-আকৃতির। তবে ওগুলো দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা হচ্ছে না, এটা শিওর। যদিও ওরা গোপনে ঠিক কী করছে বুঝতে পারিনি।'

'ভাগ্যিস পারোনি। তুমি টের পেয়েছ জানতে পারলে স্রেফ খুন করে ফেলত ওরা তোমাকে। যাক, পাঁচ বছর ধরে যে রহস্য সরকার ও পুলিশ বাহিনীকে পেরেশান করে রেখেছে, তুমি সেটা সমাধান করে ফেলেছ, মুসা।'

'যদি করে থাকি,' বলল মুসা, 'আমি একা করিনি। আমরা চারজনেই করেছি যা করার।' মাথা চুলকাল ও। 'কিন্তু আসলে কী যে সমাধান করেছি তা যদিও জানি না।'

'আমি জানি,' বলল কিশোর।

'বলো দেখি কী হচ্ছে এখানে?' প্রশ্ন করলেন আঙ্কেল।

'ওগুলো কাটিং, নাম্বারিং আর প্রিন্টিং মেশিন। ছাপা হচ্ছে কাউন্টারফিট পেপার মানি বা জাল নোট। একটা সঙ্ঘবদ্ধ দল জালিয়াতির কাজ চালাচ্ছে। এখান থেকে সিগন্যাল দিলে ডাঙা থেকে লোক এসে নিয়ে যায় বান্ডিলগুলো, ছড়িয়ে দেয়া হয় সারা দেশে।'

'ঠিক ধরেছ,' প্রশংসা ফুটল ডিক কার্টারের দৃষ্টিতে। 'কয়েক বছর ধরে লেগে আছি আমরা এর পেছনে, কিন্তু কোথায় যে ছাপা হচ্ছে ডলারগুলো, কোথা থেকে আসছে এত নিখুঁত জাল নোট কিছুতেই বের করতে পারছিলাম না।'

'সত্যিই, এই দ্বীপটাকে বেছে নিয়ে দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ওরা,' বলল রবিন। 'কে ভাবতে পারবে, প্রায়-অদৃশ্য একটা দুর্গম, পরিত্যক্ত খনি-দ্বীপের কয়েকশো ফুট গভীরে সুড়ঙ্গের ভেতর চলছে জাল নোট ছাপার কাজ? কল্পনাই তো করা যায় না। অথচ কত সহজ! শুধু একজন লোক দরকার, যে রাতের অন্ধকারে নৌকায় করে খাবার পৌঁছে দেবে, আর ছাপা নোটের বান্ডিল পৌঁছে দেবে দলপতির কাছে।'

'সহজ বলেই তো চট্ করে কারও মাথায় আসে না,' বললেন ডিক কার্টার।

'কিছু নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছিলেন আপনি, তা নইলে ওই কুটিরে এসে আস্তানা গাড়তেন না,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, ওই আনা-নেয়ার কাজের লোকটাই ফাঁসিয়ে দিয়েছে দলটাকে। এই কাজে ওর মত জেলখাটা এক দাগী আসামীকে ব্যবহার করা ওদের উচিত হয়নি।'

'ওকে চিনে ফেলেছেন আপনি?'

'ওকে চিনতাম আগে থেকেই, দ্বীপটা চিনেছি ওর ওপর নজর রাখতে গিয়ে। লক্ষ করেছি, মাছ ধরার ছলে যখন নৌকা নিয়ে সাগরে যায়, প্রথমেই যায় ডিজাস্টারে, অথচ মাছ ধরে না ওখানে; ফিরে এসে পাড়ের কাছাকাছি ফেলে ছিপ। তারপরই গাড়ি নিয়ে ছোটে শহরে।'

'আপনি নিকির কথা বলছেন?' ভুরু কপালে তুলল জিনা। 'ও-ই কি আনা-নেয়া—' আঙ্কেলকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে থেমে গেল ও। 'মাই গড!'

'হ্যাঁ। নিকি মন্টিয়ানো। আমার বোট আর গাড়িও নষ্ট করেছে

সে-ই। আমি যেমন ওকে দেখেই চিনেছি, ও-ও কি করে যেন গোয়েন্দা বিভাগের লোক হিসেবে চিনে ফেলেছে আমাকে।'

'এতে কি আমাদের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। তোমাদেরকে অনুসরণ করে হয়তো আমার আস্তানার খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু তোমরা আমাকে আইল অভ ডিজাস্টারের ব্যাপারে সচেতন হতে সাহায্য করেছ। যখনই নিকি এই দ্বীপটা সম্পর্কে তোমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিংবা যখনই তোমরা দ্বীপের দিক থেকে সঙ্কেত দেখার পর ওকে টর্চ হাতে ঘরে ফিরে আসতে দেখো; তখনই অনেক কিছু বুঝে যাই আমি। একদিন গিয়ে হাজিরও হই দ্বীপে। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু না দেখে অল্প কিছুদূর ঘোরাফেরা করেই হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে ফিরে যাই। তখনই মনে হয় পেনসিলটা পড়ে গিয়েছিল পকেট থেকে।'

'তার মানে, আমাদের দ্বারা কিছুটা হলেও উপকার হয়েছে আপনার?' বলল মুসা।

'কিছুটা নয়, অনেকটা। তোমরাই তো আবিষ্কার করেছ জাল নোটের স্তূপ, ছাপার মেশিন। আসল কাজটা করেছ তোমরাই।'

'তা হলে আপনার অ্যাকশন কী হবে এখন?'

'খুব একটা কিছু না। কাল সঙ্কেতেই আমি রেডিওর মাধ্যমে চিফকে জানিয়েছি আমার সন্দেহের কথা। বলেছি, খনির ভেতর হারিয়ে যাওয়া একটা ছেলেকে উদ্ধার করতে চললাম দ্বীপে। তাঁরা যেন দয়া করে তাঁদের যা করণীয়, একটু তাড়াতাড়ি করেন।'

'কী করবেন তাঁরা?'

'এখনও জানি না। আমি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করলে হয়তো শুরু হবে আসল কাজ।'

'এবার কি তা হলে আমরা ফিরে যাব যে-পথে এসেছি সেই পথেই?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'কিকোকে না নিয়ে নয়,' জবাব দিলেন আঙ্কেল ডিক। 'মুসা, ম্যাপটা দেখে বলো তো ঠিক কোথায় রয়েছে কিকো।'

ওকে সাহায্য করল কিশোর। আলোকিত গুহাটা দেখিয়ে দিতেই সোজা একটা গুহার উপর আঙুল বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থামল মুসা আর সবাইকে যে-ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল ঠিক তার সামনে।

'খুব সাবধান,' বললেন আঙ্কেল। 'টু-শব্দ করব না আমরা। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে আলোও জ্বালব না। ঠিক আছে? চলো এবার।'

মেইন প্যাসেজ ধরে বেশ অনেকটা এগিয়ে মেশিনের শব্দ শুনতে পেলেন ডিক কার্টার। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে বললেন, 'ঠিক। হড়হড় আওয়াজ করছে যেটা, ওটা প্রিন্টিং মেশিন। ব্যাটাদের ধরতে পারলে হই-চই পড়ে যাবে গোটা আমেরিকায়!'

তালা মারা কামরাটার কাছাকাছি আসতেই লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেয়ালে পিঠ সাঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। আঙ্কেলের কানে কানে বলল মুসা, 'এই লোকটার নাম স্মাগস।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন-চারজন। একজনের হাতে লণ্ঠন। সবাই কান খাড়া করে শুনছে ভিতরের কথাবার্তা।

কড়া গলায় ধমক দিল কেউ ঘরের ভিতর থেকে, 'আবার হাঁচি মারে! যেখানে-সেখানে হাঁচি মারবে না! রুমাল কোথায় তোমার?' একটু পরেই আবার ভেসে এল গলাটা, 'হাজার বার বলেছি

তোমাকে পা মুছে ঘরে ঢোকো! কথা কানে যায় না? আহা রে, বেচারা কিকো! আহা রে, কিকো!' এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নরম গলায় বলল, 'খাও, লক্ষ্মী ছেলে; খাও তো, সোনা।'

'ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' বলল জেক।

'অ্যাই! দরজা পটকাচ্ছ কেন?' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল কিকো ঘরের ভিতর। তারপর সিটি বাজিয়ে টানেলের ভিতর ঢুকল রেল-ইঞ্জিন।

'পাগল হয়ে গেছে!' বলল স্মাগস, 'একেবারে বদ্ধ পাগল!'

'দরজা খুলে দেখা যাক ব্যাপারটা কী,' বলল চতুর্থ জন।

'হ্যাঁ,' বলল স্মাগস। 'বিল, খোলো দরজা।'

দরজা খুলে যেতেই ভয়ঙ্কর এক চিৎকারে সবাইকে চমকে দিয়ে উড়ে চলে গেল কিকো ঘর থেকে। ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল, কেউ নেই ঘরে। অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বিলের দিকে ফিরল স্মাগস। 'গর্দভ কোথাকার! গুলি করে মারা দরকার তোমাকে! ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে পাখিটাকে আটকে রেখেছিলে এখানে!'

কথা তো সত্যি—হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বিল শূন্য ঘরটার দিকে। কাকাতুয়াটা ছিল এতক্ষণ, সেটাও চলে গেছে উড়ে। মিন-মিন করে বলল, 'গুহার ভেতর ঘুরে-ঘুরে না-খেয়ে মরবে এখন ছোকরা। কোন্ ফাঁকে যে বেরিয়ে গেল টেরও পাইনি।'

'কোন্ ফাঁকে আবার,' ভুরু কুঁচকে জেক বলল, 'ওই যখন তোমাকে ঠোকর আর খামচি দিল বদমাশ পাখিটা, বাতি ফেলে দিলে; ঠিক তখনই আলগোছে বেরিয়ে গেছে। ভেতরে কথা হচ্ছে শুনে তুমি মনে করেছ ঘরেই আছে বুঝি কেলে ভূতটা।'

'সত্যিই গর্দভ আমরা,' বলল স্মাগস। 'প্রথমবার বোকা বনেও

আক্কেল হল না আমাদের, আবার ঠকার প্রয়োজন হল।' দরজা খোলা রেখেই পিছন ফিরল ও, 'চলো, কাজটা শেষ করি। আজই শেষ করতে হবে সব কাজ।'

মেশিনঘরের দিকে চলে গেল ওরা।

চমকে উঠল মুসা। কিকো এসে বসেছে ওর কাঁধে। ওর কানে কানে আদর করে বলছে কী সব। ওর কান কামড়ে দেওয়ার ভান করছে, চুমো দেওয়ার মত শব্দ করছে। মুসাকে পেয়ে এত খুশি হয়েছে যে কাঁপছে উত্তেজনায়। ওর ছোট্ট মাথাটা চুলকে দিল মুসা। পকেট থেকে সূর্যমুখীর বিচি বের করে খাওয়াল।

'হয়েছে, এবার চলো,' বললেন ডিক কার্টার। 'আর দেরি করা যায় না। এক্ষুনি ফিরে যাব আমরা আবার সাগরের নীচ দিয়ে নিউ ফোর্টে।'

দ্রুতপায়ে চলল ওরা মেইন প্যাসেজের দিকে। প্যাসেজ ধরে কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল সবাইকে। কারা যেন আসছে পিছন দিক থেকে।

মুখ চেপে ধরা টর্চ নিভিয়ে দিল ওরা। একটা গর্ত মত জায়গায় লুকাবার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু ঢুকতে গিয়ে একটা পাথরে পা বেধে পড়ে গেল জিনা। হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে 'উহ্!' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

জিনাকে নকল করে চেঁচিয়ে উঠল কিকোও, 'উহ্, বাবা রে!'

দপ করে জ্বলে উঠল দুটো টর্চ। তীক্ষ্ণ একটা গলা ভেসে এল টর্চের পিছন থেকে। 'খবরদার! কেউ নড়লেই গুলি করব! উঠে দাঁড়াও, অ্যাই মেয়ে!'

অপরিচিত তীক্ষ্ণ, কর্কশ, কর্তৃত্বপূর্ণ গলা।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে সবাই। মুখ বিকৃত করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জিনা। লোকটার পাশ থেকে আরেকটা গলা শোনা গেল। এর হাতেও পিস্তল দেখা যাচ্ছে টর্চের আবছা আলোয়। পিস্তলটা চিনতে অসুবিধে হল না ডিক কার্টারের।

'এই লো-ল্লোকটাই টি-ট্রিকটিকি, বস্! দি-দ্দিই শেষ করে?'

'নি-ন্নিকি ব্যাটা!' বলে উঠল কিকো। বলেই মুসার ইশারায় ওর কাঁধ ছেড়ে উড়াল দিল। অন্ধকার গুহায় ও কোন্‌দিকে গেছে বোঝা গেল না।

'দাঁড়া! তো-ত্তোকে আমি...'

পিস্তলটা তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিকিকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল ওদের বস, 'তুমি না ওর বোটটা ভেঙে দিয়ে এসেছ বললে। তা হলে ও এখানে এল কী করে?'

'মনে হয়, পু-প্পুরনো গুহা দিয়ে। ওই, যেয্-যেটা আমরা...'

'থামো! আগে থেকে সব ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলার দরকার নেই। যা ঘটবে, দেখতেই পাবে সবাই। তুমি সামনে থেকে ওদের ওপর টর্চ ধরে রেখে পেছনে হাঁটবে, আমি থাকব ওদের পেছনে।'

সাবধানে গর্তের মুখ ছাড়িয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নিকি।

'গুলি খেতে না চাইলে হঠাৎ কিছু করতে যেয়ো না,' বলল লোকটা। 'মাথার ওপর হাত তুলে এগোও ধীরে ধীরে।'

পিস্তল তাক করে রেখে পিছাতে শুরু করল নিকি। এগোল ওরা। পিছনে উদ্যত পিস্তল হাতে তৈরি থাকল ধূর্ত দলপতি।

ষোলো

আবার সেই একই বন্দিশালা।

গলা চড়িয়ে বিলকে ডাকল নিকি। কাছেপিঠেই ছিল কোথাও, ডাক শুনে ছুটে এসে বসকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। দরজার চাবিটা চেয়ে নিল নিকি। সবাইকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিজেই চাবি দিল দরজায়, তারপর চাবিটা রেখে দিল নিজের পকেটে।

'কী কপাল!' বলল রবিন।

'কিকোকে উদ্ধার করতে গিয়েই গুবলেট হয়ে গেল সব,' বলল মুসা। 'এখন আমাদের জান নিয়ে টানাটানি।'

'কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না আমাদের। দলের একজনকে বন্দি অবস্থায় ফেলে তো আর পালানো যায় না। কি বলো, কিশোর?'

'শুধু দুঃখ, কাছেপিঠে কোনও রিপোর্টার নেই। থাকলে কাল পত্রিকার হেডিঙে নিউজ হয়ে যেতাম আমরা। **"একটি পাখির জন্য পাঁচ গোয়েন্দার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ!"**

'পাঁচ গোয়েন্দা মানে?' অবাক হলেন ডিক কার্টার।

'আপনি একজন গোয়েন্দা না?'

'তাতে কী? তাই বলে তোমরাও গোয়েন্দা হয়ে গেছ নাকি?'

'কিশোর-মুসা-রবিন যে রকি বীচের বিখ্যাত 'তিন গোয়েন্দা',

আপনি এখনও জানেন না?' বলল জিনা। 'নিজেদের পরিচয় মুখ ফুটে বলতে পারেনি ওরা আপনাকে।'

'বলো কী!' টর্চ জ্বেলে তিনজনকে দেখলেন আঙ্কেল অবাক চোখে। 'আরে! তোমাদের সম্পর্কে তো পড়েছি আমি কাগজে! তোমরাই সেই তিন গোয়েন্দা নাকি? এত অল্প বয়স! আমি ভেবেছি ওরা অন্তত বিশ-বাইশ বছরের হবে।' হাসলেন ডিক, 'জীবনের শেষ মুহূর্তে পরিচয় হল, তবু ভালই লাগছে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। কিন্তু জিনা? ও-ও কি গোয়েন্দা নাকি?'

'জিনা গোয়েন্দা নয়,' বলল রবিন। 'কিন্তু ও আমাদের এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে সবাই ওকেও গোয়েন্দা মনে করে।'

অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর একটা বাস্তব প্রশ্ন তুললেন আঙ্কেল ডিক। 'বিপদের গুরুত্বটা তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমরা অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। এরপর আমাদেরকে খুন না করে আর কোনও উপায় নেই ওদের। আমরা বাঁচলে মারা পড়বে ওরা।'

'কাজেই, আপনি তো শেষই,' কিশোরের বক্তব্য শেষ করল রবিন, 'বয়স কম বলে আমরা যে ওদের কাছ থেকে কোনরকম করুণা পাব, সে-আশা করা বোকামি। অর্থাৎ আমরাও শেষ।'

'তবে একটা কথা আছে,' বলল মুসা, 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কেউ জানে না শেষপর্যন্ত কী হবে। কেউ বলতে পারবে না কারা মরবে—ওরা, না আমরা।'

ওদের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ডিক কার্টার। কারও চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বিপদ এলে যথাসাধ্য মোকাবিলা করবে, মরতে হলে মরবে বীরের মত। অসাধারণ কী যেন রয়েছে

ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

তালায় খড়মড় আওয়াজ শুনে সিধে হয়ে বসল ওরা। সাড়ে-চার ঘণ্টা পর খুলল দরজাটা। কামরায় ঢুকল নিকি। ওর সঙ্গে রয়েছে বিল, জেক, স্মাগস ছাড়াও আরও তিন-চারজন ষণ্ডা কিসিমের লোক।

'বিব্-বিদায় সম্ভাষণ জা-জ্জানাতে এলাম,' বলল নিকি।

জেক এগিয়ে এসে দাঁড়াল নিকির পাশে। বলল, 'আমাদের এখানকার কাজ শেষ। একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছ তুমি, গোয়েন্দা ডিক কার্টার। এখন আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না তুমি আমাদের। সব টাকা নিয়ে আজই সরে পড়ছি আমরা এখান থেকে। এত টাকা বানিয়েছি যে, সারা জীবন দু-হাতে খরচ করেও শেষ করতে পারব না।'

'তা হলে এবার কেটে পড়ার তাল করেছ তোমরা?' শান্ত গলায় বললেন ডিক কার্টার। 'ভেবেছ মেশিনগুলো ভেঙেচুরে ফেলে রেখে জাল নোট নিয়ে সরে পড়বে। প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করা এতই সহজ? এভাবে পার পাবে না তোমরা, মিয়া। কোথাও পালিয়ে বাঁচতে...'

'প্রমাণ থাকলে তো পাওয়ার প্রশ্ন,' বলল স্মাগস। 'কিচ্ছু পাওয়া যাবে না কোনদিন। কিচ্ছু না। সারা দেশের সমস্ত গোয়েন্দা-পুলিশ এলেও আমাদের বিরুদ্ধে একটা তথ্য বা প্রমাণ পাবে না এখানে। কোনদিন না!'

'কেন পাবে না?' বিস্ময় চাপতে না পেরে জানতে চাইলেন ডিক। 'কোথায় যাবে এত মেশিনপত্র?'

'পাম্পানির নীচে,' কুৎসিত হাসি ফুটল নিকির মুখে। 'আমরা...'

'ডুবিয়ে দিচ্ছি সুড়ঙ্গগুলো,' নিকির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে

বলল জেক। 'ডিনামাইট ফাটিয়ে সাগরের পানি নামিয়ে আনছি আমরা। আর কিছুক্ষণ পরেই। প্রতিটা গুহা, প্রতিটা প্যাসেজ, প্রতিটা টানেল ভরে যাবে পানিতে। চিরকালের জন্যে পানির নীচে হারিয়ে যাবে আমাদের মেশিনপত্র, সমস্ত প্রমাণ। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে তোমরাও।'

'আমাদের এখানেই ফেলে রেখে যাবে না নিশ্চয়ই?' প্রশ্ন করলেন আঙ্কেল। নিকিকে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললেন, 'আমি না হয় তোমাদের পিছনে লেগেছি, আমাকে এখানে আটকে মারতে পারো। কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কী দোষ করেছে? কারও কোনও ক্ষতি করার সাধ্যই নেই এদের। এদেরকে তো ছেড়ে দেয়া উচিত তোমাদের।'

'এদেরকে ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না,' বলল বিল। হাত বুলাল কপালের ক্ষতর উপর। 'এরা একেকটা বিচ্ছু। ছেড়ে দিলেই সোজা গিয়ে হাজির হবে পুলিশের কাছে।'

'তা-ওাছাড়া আমরা হু-হু-হুকুম তামিল করছি।'

এবার জেকের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল, 'হাজার-হাজার বছর ধরে সমুদ্রের কোটি-কোটি টন পানির চাপে যে-ছাদের কিচ্ছু হল না; ভাবছ, তোমরা একটা ডিনামাইট ফাটিয়ে দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সে-ছাদ?'

'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাবে,' বলল স্মাগস। 'অনেক আগেই আমরা বোরিং করে সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছি। যে-পথে তোমরা আজ দ্বীপে এসেছ, সেই সুড়ঙ্গেরই এক দুর্বল জায়গায় ফিট করা হয়েছে ডিনামাইট।'

কিশোরের মনে পড়ল সুড়ঙ্গের এক জায়গায় পাথর সরিয়ে এ-

পাশে আসার কথা। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল ওর। ওখান থেকে হড়হড় করে পানি নেমে এলে কী হবে কল্পনা করতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। সাগরের উপর-লেভেল পর্যন্ত উঠে আসবে পানি, তারপর থামবে। তলিয়ে যাবে সবকিছু।

'অনেক গ-গল্প হল,' ঘড়িটা দেখে নিয়ে একহাত তুলে টা-টা দেওয়ার ভঙ্গি করল নিকি। 'এবার চ-চ্চলি, গুডবাই!'

'আচ্ছা, দেখা হবে শীঘ্রি,' বলে হাত নাড়লেন ডিক কার্টার।

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে তালা মেরে দিল নিকি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল বাম দিকে। অর্থাৎ, ওরা এখন মেইন প্যাসেজ ধরে চলে যাবে বড় শ্যাফটের দিকে। ডিনামাইট ফাটতে আর বেশি দেরি নেই। মুখ শুকিয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের।

'ঘাবড়াও মাত,' বললেন আঙ্কেল ডিক। 'অত সহজে মরছি না আমরা। আর এই ঘরে তো নয়ই। ওরা একটু দূরে সরে যাক না, দরজাটা খুলে বেরিয়ে যাব আমরাও।'

'কীভাবে...' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল রবিন।

আঙ্কেল ডিকের হাতে বেরিয়ে এসেছে সরু একজোড়া চুলের কাঁটার মত যন্ত্র। তিন মিনিটের মধ্যেই খুট শব্দ করে খুলে গেল তালা। একগাল হেসে ডিক বললেন, 'এই ভাবে! দেখলে? এসব কায়দা তিন গোয়েন্দারও শিখে রাখা দরকার। দাঁড়াও, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েই শিখিয়ে দেব।' হাসলেন তিনি। 'এবার ছোটো দেখি সবাই মেইন শ্যাফটের দিকে।'

ঘর থেকে বেরোতেই মুসার কাঁধে এসে বসল কিকো। বসেই শাসাল, 'ঘাড় মটকে দেব! দ-দ্দরজাটা বব্-বন্ধ করো!'

মেইন প্যাসেজে পড়েই ছুটল ওরা বড় শ্যাফটের দিকে। বেশ

সময় লাগল পৌঁছতে। শ্যাফটের নীচে দাঁড়িয়ে উপরে দিনের আলো দেখতে পেল ওরা।

ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ভারী, গম্ভীর আওয়াজ। অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি শোনা গেল শব্দটার।

'নিকি তা হলে ঠিক কথাই বলেছিল। ডিনামাইটের শব্দ ওটা। যদি সাগরতলের পাথরে সত্যিই গর্ত হয়ে থাকে, তা হলে শুরু হয়ে গেছে পানি নামা। সুড়ঙ্গগুলো পানিতে ভরে যাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে চারদিকে টর্চের আলো ফেলেই আঁতকে উঠলেন ডিক কার্টার, 'হায়, হায়! মইটা কেটে ফেলে দিয়ে গেছে!'

শ্যাফটের মেঝেতে একপাশে স্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে দড়ির মই। উপর দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল পনেরো ফুট উঁচুতে ঝুলছে মইটা। এই কাজটা করেছে, যদি ওরা কোনভাবে তালা খুলে ঘর থেকে বেরোতে পারেও, মই বেয়ে যেন উপরে উঠতে না পারে।

'এবার গেছি আমরা!' বললেন ডিক কার্টার।

'একটা বাঁশের মই দেখেছিলাম ওই আলো-জ্বলা ঘরটায়, বাক্সগুলোর পাশে!' বলল মুসা। 'দৌড়ে গেলে হয়তো বিশ মিনিটে ফিরে আসতে পারব।'

"চলো, দৌড় দিই!' বললেন আঙ্কেল ডিক।

কিন্তু ওখানে পৌঁছনো সম্ভব হল না। মেইন প্যাসেজ ধরে গজ বিশেক যাওয়ার পরই থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখতে পেল, বামপাশের সুড়ঙ্গ থেকে কুচকুচে কালো পানি আসতে শুরু করেছে প্যাসেজে। আর কোনও সন্দেহ থাকল না। সত্যিই ছাদ ভেঙে

নামছে গুহায় সাগরের পানি।

জিনার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে রাখল কিশোর। টের পেল থরথর করে কাঁপছে জিনা।

'চিন্তা নেই, আঙ্কেল,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'চলেন, আমরা শ্যাফটের নীচে গিয়ে দাঁড়াই। সবাই সাঁতার জানি। সাগরের পানি পনেরো-বিশ ফুট ওপরে উঠতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তখন নাগাল পাব মইয়ের।'

'ঠিক বলেছ, কিশোর!' প্রশংসা ঝরে পড়ল আঙ্কেল ডিকের কণ্ঠে। 'প্যাসেজে থাকলে মরণ। দেখো দেখি, এমনই ভয় পেয়েছি যে এই সাধারণ বুদ্ধিটাও উড়ে গেছে মাথা থেকে। চলো, চলো! ফিরে চলো সবাই!'

মাথা কাত করে কালো পানির স্রোত দেখছে কিকো। ভয় পেয়েছে। বলল, 'খাইছে!'

চারদিক থেকে কলকল করে পানি আসছে এখন। এতই দ্রুত হাঁটু পর্যন্ত উঠে এল যে বুঝতে পারল ওরা, মস্তবড় ফাঁক হয়েছে ছাদে। পানির আওয়াজটা ভয়াবহ লাগছে। হুড়মুড় করে গোটা দ্বীপটা ধসে পড়বে না তো মাথার উপর?

পানি উঠে এল কোমর পর্যন্ত। গরম খনির ভিতর খুব ঠাণ্ডা লাগছে সাগরের পানি। বুক সমান উঠল পানি, তারপর চলে এল নাকের কাছে। যতক্ষণ পারা যায় পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর শুরু করল সাঁতার।

'হাত-পা যতটা সম্ভব কম নেড়ে শুধু ভেসে থাকো,' বললেন আঙ্কেল ডিক। তিনিও সাঁতার কাটছেন এখন।

কিশোরের পকেট টর্চটা এখন ওর দাঁতের ফাঁকে। ওটার আলোয় ভৌতিক ছায়া পড়ছে শ্যাফটের দেয়ালে। কিকোর ছায়া

দেখে মনে হচ্ছে বিকট এক টেরোড্যাকটিল। মুসার মাথায় বসে আছে ও এখন।

ছোট্ট জায়গায় পাঁচজন প্রায় খাড়া অবস্থায় সাঁতার কাটছে, হাত-পা লেগে যাচ্ছে এর-ওর গায়ে। মাঝে-মাঝে একপাক ঘুরে দেখে নিচ্ছে কিশোর মইটা আর কতদূরে।

বেদম হাঁপাচ্ছে রবিন। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হয়েছে। ওদের মধ্যে ও-ই সাঁতারে একটু কাঁচা।

আধঘণ্টা ভেসে থাকবার পর মুসা হাতে পেল মইটা, রবিনের বাহু ধরে টেনে এনে ধরিয়ে দিল ওটা।

'থ্যাঙ্ক ইউ!' বলল রবিন হাঁপাতে হাঁপাতে। 'আর পারছিলাম না।'

রবিন মই বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে গেলে জিনা উঠল, তারপর কিশোর। মুসার পর উঠলেন আঙ্কেল ডিক।

'ধীরে সুস্থে বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে ওঠো,' বললেন আঙ্কেল। 'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। আর দয়া করে কেউ আমার ঘাড়ে পোড়ো না।'

ক্লান্ত দেহে ওদের মনে হল, মই বেয়ে উঠছে তো উঠছেই, হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে তবু উঠছে, বছরের পর বছর কেবল উঠছেই। হঠাৎ খোলা বাতাসের আভাস পেয়ে রবিন বলে উঠল, 'এসে পড়েছি প্রায়!'

গুড নিউজ। খুশি হয়ে উঠল সবাই। দ্রুততর হল ওঠা।

উঠেই বোকা হয়ে গেল রবিন। কূপের কিনারায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে একজন লোক, হাতে রিভলভার।

'হ্যান্ডস আপ!' নিচু গলায় কর্তৃত্বের সুরে বলল লোকটা। 'পরের জনকে সাবধান করার চেষ্টা কোরো না। ওপাশে সরে দাঁড়াও। কথা কানে যাচ্ছে না? কী বলেছি?—হ্যান্ডস আপ!'

সতেরো

মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। হতাশায় ছেয়ে গেছে অন্তর। এত কষ্ট করে নিশ্চিত মৃত্যু এড়িয়ে খনি থেকে উপরে উঠে এসেও মুক্তির স্বাদ পেল না, ধরা পড়তে হল আবার।

জিনাকেও একই ভাবে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড় করানো হল। কিশোরকে বাগে আনতে গিয়ে ওর পেটে রিভলভার দিয়ে একটা গুঁতোও দিতে হল। মুসাকেও মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াতে হল। অসুবিধে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ওর মাথায় উঠে বসল কিকো, এবং কর্কশ গলায় ধমক দিল রিভলভারধারীকে।

খনিমুখ দিয়ে কয়েকটা কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েকে উপরে উঠে আসতে দেখে রীতিমত অবাক হয়েছে লোকটা, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না; ধৈর্যের সঙ্গে বসে রয়েছে পরের জন ওঠার অপেক্ষায়।

একই আদেশ দেওয়া হল আঙ্কেল ডিককেও। দ্বিধামাত্র না করে মাথার উপর হাত তুললেন তিনি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন। হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াও মাত, ড্যান। উই আর ফ্রেন্ডস। তোমার অস্ত্র সরাও।'

'আরি, বস্!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। রিভলভারটা গুঁজে

রাখল বেল্টে। 'আপনি এদিক দিয়ে বেরোচ্ছেন! সকাল থেকে খুঁজে মরছে সবাই আপনাকে, কোথাও না পেয়ে কথায় কথায় খেপে উঠছেন চিফ আমাদের সবার...'

'তুমি এখানে বসে কী করছ?'

'আমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছেন চিফ, যদি জালিয়াত গ্যাঙের আরও কেউ বেরোয়, তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে। আধঘণ্টা বসে থেকে দেখি বাচ্চা ছেলেমেয়ে বেরোতে শুরু করেছে! নামাও, নামাও, হাত নামাও তোমরা। এরা কারা, বস্?'

সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আঙ্কেল। তারপর খনির অবস্থা জানালেন। বললেন, জীবিত আর কেউ নেই ওখানে যে বেরোবে। জিজ্ঞেস করলেন এদিকের খবরাখবর।

'সবকটাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হেড থেকে টেইল পর্যন্ত সবাইকে। চলেন না, দেখবেন মজা। আপনাকে ফিরে পেয়ে চিফের কলজেটাও ঠাণ্ডা হবে।'

গিরিপথ দিয়ে বেরিয়ে সাগরতীরে চলে এল সবাই।

ওখানে দুজন পিস্তলধারীর প্রহরায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আট-নয়জন জালিয়াত। নোটগুলোও টাল দিয়ে রাখা ওদের পাশে। নিকিও রয়েছে ওদের মধ্যে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডিক কার্টারকে এইদিকে আসতে দেখে ঝুলে পড়ল ওদের চোয়াল। বুঝে ফেলেছে, এবার আর আইনের হাত থেকে নিস্তার নেই। জালিয়াতি তো আছেই, অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের দায়েও শাস্তি পেতে হবে ওদের।

নিকির বোটের পাশে দু-দুটো মোটর বোট দেখে বুঝতে পারল কিশোর, গত রাতে আঙ্কেলের ওয়ায়েরলেসে খবর পেয়ে ওগুলোতে

করেই এসেছে সরকারী লোকজন। এখন ওতে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে তোলা হচ্ছে হাতকড়া পরানো বন্দিদের।

চিফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আঙ্কেল তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে। ওদের কৃতিত্বের কথাও বললেন মুক্ত কণ্ঠে। সব শুনে ওদের পিঠ চাপড়ে দিলেন গোয়েন্দা বাহিনীর চিফ। ভেজা জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখে ডিক কার্টারকে নির্দেশ দিলেন ওদেরকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। নিকির বোটে করে রওনা হয়ে গেল ওরা নিউ ফোর্টের উদ্দেশে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নিকি।

'নি-ন্নিকি ব্যাটা!' বলল কিকো। তারপর 'অহ্-হো' করে কাশি দিল একটা। নিকিকে কটমট করে ওর দিকে চাইতে দেখে অট্টহাসি দিল ও, 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা!'

পাল তুলে দিল মুসা আর রবিন, কিশোর ধরল হাল। চিত হয়ে পাটাতনে শুয়ে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিয়েই হাতটা বের করে নিলেন আঙ্কেল ডিক—সব ভিজে শেষ।

কিকো গিয়ে বসেছে মাস্তুলের ডগায়। জোর বাতাসে ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য অল্প একটু মেলে রেখেছে পাখা দুটো। শিস দিচ্ছে মনের সুখে। কাছ দিয়ে কোনও পাখি গেলেই তাকে দরজা পটকাতে বারণ করে চমকে দিচ্ছে।

খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন মলিফুফু। আঙ্কেল ডিকের কাছে সব শুনে ছানাবড়া হয়ে গেল তাঁর চোখ। সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ডিক কার্টার কিছুতেই এখানে থাকতে রাজি হলেন না, ডিনার সেরে চলে গেলেন তাঁর কুটিরে। ওখানে রয়েছে তাঁর সিগারেটের প্যাকেট।

পরদিন নাস্তার টেবিলে বসে গল্প করছে সবাই। আজ প্রফেসর স্যামুয়েলসনও হাজির। রাতে স্ত্রীর মুখে সব শুনে আত্মা চমকে গেছে তাঁর।

'এখন তোমাদের এ-বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে যেতেই হবে, ফুফু,' বলল জিনা।

'আমি তো কবে থেকেই বলছি, কিন্তু তোর ফুফাকে কিছুতেই রাজি করানো যায় না। এই নিরিবিলি পরিবেশ...'

'হ্যাঁ, পরিবেশটা সত্যিই অপূর্ব,' বলল কিশোর। 'কিন্তু ফুফাকেও এখন এই বাড়ি ছাড়তে হবে। এখানে বাস করার আর উপায় নেই।'

'কেন?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'নিকি চলে গেল জেলে,' বলল জিনা, 'এখানে কাজের লোক পাবে না তোমরা আর। নিকি এখানে ছিল ওর নিজের সুবিধে হচ্ছিল বলে। আরেকটা জালিয়াত তোমরা পাবে কোথায়?'

'তা বটে,' বললেন প্রফেসর। 'কাজের লোক না পেলে এখানে থাকা খুবই মুশকিল হবে।'

'লোক পেলেও হবে,' বলল কিশোর। 'সাত-আট মাইলের মধ্যে খাওয়ার পানি নেই কোথাও।'

'কেন?' আলোচনায় যোগ দিলেন মলিফুফু। 'ইঁদারা থেকে পানি তুলে...'

'আর ওখানে মিষ্টি পানি পাবেন না, আন্টি,' বলল কিশোর। 'ডিনামাইট দিয়ে সুড়ঙ্গের ছাদ ফাটিয়ে দিয়েছে ওরা। সমুদ্রের পানি ঢুকিয়ে সব খনি পানির নীচে তলিয়ে দিয়েছে। এই ইঁদারাতেও নিশ্চয়ই অনেক ওপরে উঠে এসেছে পানি। মিঠে পানির ঝর্নাটা চাপা পড়েছে সাগরের লবণ-পানিতে।'

'হায়, হায়! তাই নাকি? তা হলে তো আজই শহরে বাড়ি খুঁজতে হয়! যা তো, জিনা, একটু পানি তুলে আন তো দেখি।'

চারজনই ওরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখল ওরা, কিনারায় দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকলে নিজের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ত্রিশ ফুট নীচেই টলটল করছে পানি। বালতি নামিয়ে পানি তুলে প্রথমে চেখে দেখল ওরা নিজেরা, তারপর একটা কাপে করে কিছুটা নিয়ে এল রান্নাঘরে।

আঙুল ভিজিয়ে জিভে ঠেকিয়েই মুখ কালো হয়ে গেল ফুফার।

'গাড়িটা বের করতে হবে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এতদিন পর আমি কি চালাতে পারব ওটা?'

'আমি নিয়ে যাব আপনাকে কপারটাউনে,' বলল মুসা।

কপারটাউনের ভাড়া বাড়িতে থাকল ওরা এক সপ্তাহ। ইতিমধ্যে একদিন আঙ্কেল ডিকের সঙ্গে গিয়ে জবানবন্দি দিয়ে এসেছে ওরা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। রবিনের তোলা খালি টিনের ছবিটা খুব কাজে দিয়েছে। ও যে দ্বীপে খাবার সরবরাহ করত, প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে নিকি। কারণ, ওই খালি টিনগুলো পাওয়া গেছে নিউ-ফোর্টে নিকির গোপন সেলারে।

রকি বীচে ফিরে আসার দিন প্রফেসরের ঘরে ঢুকে 'অহ্-হো' করে কাশি দিয়ে চমকে দিল কিকো তাঁকে, পা মুছে ঘরে ঢোকার নির্দেশ দিল। বকা দিল, 'দরজাটা বন্ধ করো, গাধা কোথাকার! রুমাল কোথায় তোমার?'

তারপর তাড়া খেয়ে ফুড়ুত করে উড়ে পালাল।

-শেষ-

২২ জানুয়ারি প্রকাশিত হচ্ছে
কিশোর থ্রিলার
হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা
শামসুদ্দীন নওয়াব

ক্যাম্পিং করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়ল তিন গোয়েন্দা। প্রচণ্ড বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে আশ্রয় নিল এক নির্জন বাড়িতে। কিন্তু ওখানে ঢোকার পর থেকেই ঘটতে লাগল একের পর এক অদ্ভুত ঘটনা। তিন গোয়েন্দা টের পেল হানাবাড়িতে আটকে পড়েছে ওরা—পালাবার পথ নেই।

আরও আসছে
কিশোর থ্রিলার/তিন গোয়েন্দা
মরণসঙ্কেত
শামসুদ্দীন নওয়াব

সবাই বলে, যেয়ো না ওই রহস্যময় গুহায়, মারাত্মক বিপদ ঘটবে। কেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।
জানল, ওখানে বাস করে এক ভূত। গুহার ভেতর বেজে ওঠে ভূতের ঘণ্টি, সতর্ক করে দেয়, পালাও!
পালাতে হবে। নইলে ঘটবে ভয়ঙ্কর বিপদ। ভাল চাও তো ওই ভুতুড়ে গুহার ধারেকাছেও যেয়ো না!'
ঠিক করে ফেলল কিশোর, ও যাবেই যাবে! জিনা, রবিন আর মুসাও চলল ওর সঙ্গে। কি, সঙ্গী হবে নাকি ওদের? সাহস থাকলে সাগরে নৌকো ভাসাও, বিপজ্জনক অভিযান আর গভীর রহস্যে জড়িয়ে পড়ো ওদের সঙ্গে। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে কি না তা কিন্তু —
বলা যাচ্ছে না এখুনি!

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

তনয়া দেওয়ান,

রাঙ্গামাটি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।

আমি নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত তিন গোয়েন্দা সিরিজ পড়ে আসছি। আমি মনে করি রকিব আঙ্কেলের মত লেখক পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু 'মমি রহস্যে'র আলোচনা বিভাগে জানতে পারলাম, রকিব আঙ্কেল কয়েক মাস যাবত এই সিরিজ লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন বন্ধ করে দিয়েছেন? তাহলে কি আমরা তিন গোয়েন্দা সিরিজের ভাল ও মানসম্পন্ন বই পাব না? দয়া করে আমার মনের খটকা দূর করবেন।

লিখন, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

তিন গোয়েন্দার 'মমি রহস্য' পড়লাম, খুব ভাল লেগেছে। এই রকম বই আরও চাই। রকিব আঙ্কেল আর তিন গোয়েন্দা লিখবেন না জেনে খুব কষ্ট পেয়েছি। তবে শামসুদ্দীন নওয়াব আঙ্কেল যদি নিত্য নতুন কাহিনী উপহার দেন তবে কষ্ট ভুলতে দেরি হবে না—এটাও সত্য। রকিব আঙ্কেলকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, আর শামসুদ্দীন আঙ্কেলকে কংগ্রাচুলেশন। আচ্ছা, রকিব আঙ্কেল তিন গোয়েন্দা লেখা কেন বন্ধ করলেন?

রিন্তু, আজমীর ভবন, গোলাবাড়ীয়া, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

আমি ভাল নেই। এসব কি শুনছি? রকিব আঙ্কেল নাকি তিন গোয়েন্দা লিখবেন না? সেই ক্লাস থ্রী থেকে তিন গোয়েন্দা পড়ে আসছি এবং সবসময়

বইয়ের উপর তাঁর নাম দেখে আসছি। সেই জায়গায় অন্য আর একজনের নাম, ঠিক মেনে নেয়া যায় না।

তবে হ্যাঁ, নতুন লেখকের তিন গোয়েন্দাগুলো ভাল লেগেছে। যদিও কিশোরের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটা, মুসার 'খাইছে' বলা এগুলো একটু যেন কমই উল্লেখ করেছেন।

❑ তনয়া, লিখন ও রিন্তুর চিঠির বিষয়বস্তু মোটামুটি এক, তাই একই সঙ্গে তিনজনের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

রকিব হাসান কেন যে তিন গোয়েন্দা লেখা বন্ধ করলেন সেটা আমাদের কাছেও এক রহস্য। হঠাৎ করে বললেন, পেপারব্যাকের কোনও ভবিষ্যৎ নেই–তিনি আর পেপারব্যাকে লিখবেন না; হার্ডবাউন্ড বই-ই লিখবেন শুধু। বেশ কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মাধ্যমে হার্ডবাউন্ড বই বের করতে শুরু করলেন। আমরা যখন দেখলাম, মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, তিনি কিছুতেই তিন গোয়েন্দা লিখছেন না; পাঠকপ্রিয় সিরিজটা বন্ধ হতে চলেছে, তখন উপযুক্ত আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে প্রটাকে চালু রাখবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলাম।

শামসুদ্দীন নওয়াবের লেখা গত চোদ্দোটি বই মানসম্পন্ন হয়নি, একথা কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমরা একজনও বলোনি। তবে তোমরা অনেকেই জানাচ্ছ, কিছুকিছু ছোটখাট ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে নতুন লেখকের রচনায়। আমরাও জানি, হুবহু রকিব হাসানের মত হচ্ছে না; একসঙ্গে একশো ষাটটা বই মাথায় রেখে, পূর্বাপর পারম্পর্য রক্ষা করে লেখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এমন কী রকিব হাসানের পক্ষেও না। একটু এদিক-ওদিক হবেই। ভিন্ন কলমে ভিন্ন জাদু, ভিন্ন স্বাদ–এ তো হবেই হবে। তবে সিরিজটা বাঁচিয়ে রাখবার স্বার্থে ওটুকু তোমাদের মেনে নিতে হবে।

নইলে বিকল্প রাস্তা একটিই: সিরিজটা বন্ধ করে দিতে হয়।

বলো, যে লিখবে না, তাকে দিয়ে লেখানো কি সম্ভব?

আইরিন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

রকিব আঙ্কেল আর তিন গোয়েন্দা লিখবেন না শুনে যে এতটা খারাপ লাগবে তা কখনও চিন্তা করিনি। ওঁর এই হঠাৎ তিন গোয়েন্দা লেখা ছেড়ে দেয়াতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে তিন গোয়েন্দার মান নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেও পরে স্বীকার করতেই হল, তিন গোয়েন্দার কিছুই বদলায়নি। এজন্য শামসুদ্দীন নওয়াব আঙ্কেলকে প্রশংসা করতেই হয়। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

❑ তোমার ধন্যবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন **একটি** বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১২/১/'০৪ বাস্কারভিলের হাউন্ড (রিপ্রিন্ট/অনুবাদ) **স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/আসাদুজ্জামান**

বিষয়: আবার কি ফিরে এল বিস্মৃতপ্রায় কিংবদন্তীর সেই ভয়াল পিশাচ-হাউন্ড? অত্যাচারী জমিদার হিউগো বাস্কারভিলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন তাঁর অধস্তন পুরুষেরা। বৃদ্ধ স্যার চার্লসও কি শিকার হয়েছেন ক্ষমাহীন অপঘাত মৃত্যুর? প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শারলক হোমসের কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছে নৃতত্ত্বপাগল প্রতিভাবান ডাক্তার জেম্স মরটিমার। এবার পালা পরিবারের শেষ সন্তান স্যার হেনরির। হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁকে অভিশপ্ত বাস্কারভিলের হল্। আসছে শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় ট্রেন। পাঠক, চলুন রওনা হয়ে যাই বিশাল বন্ধ্যা রহস্যময় মুরল্যান্ডের পথে···

১২/১/'০৪ নেকড়ের ডাক+আতঙ্কের প্রহর (রিপ্রিন্ট/শিশাচ কাহিনী) **অনীশ দাস অপু**

নেকড়ের ডাক: আমার মন বলছিল ভয়ঙ্কর এবং অশুভ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওখানে। বুকে হাঁটার ভঙ্গিতে হাত দুটো বেরিয়ে এল। এমন সময় কালো মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। অস্পষ্টভাবে দেখলাম বিশাল মাথা এবং চওড়া কাঁধ নিয়ে কি যেন একটা মানুষের আকৃতির মত উঠতে যাচ্ছে। কিন্তু কি ওটা?

আতঙ্কের প্রহর: বিচিত্র এবং ভিন্ন স্বাদের এক ডজনেরও বেশি গল্প আছে বইটিতে। 'আতঙ্কের প্রহর'-এ নির্জন কটেজে এক ম্যানিয়াকের কবলে তরুণী জেনের প্রাণ সংশয় আপনাকে আতঙ্কিত করে তুলবে। 'প্রতিহিংসা' গল্পে দু'জন মানুষের রোমহর্ষক প্রতিশোধের ধরন আপনাকে করবে চমকিত। এছাড়াও, অন্যান্য গল্পগুলো পড়ার সময় ভয়, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা আচ্ছন্ন করে রাখবে আপনাকে।

আরও আসছে

১৯/১/'০৪ সবুজ সঙ্কেত	(রানা ৩৩৫)	কাজী আনোয়ার হোসেন
১৯/১/'০৪ শ্বাপদসঙ্কুল ১+২+৩	(রানা/রিপ্রিন্ট)	কাজী আনোয়ার হোসেন